বাংলাদেশের কৃষি
(Agriculture of Bangladesh)

ইউনিট ৬

ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষি উৎপাদিত পণ্য ও কৃষিভিত্তিক শিল্প। অনুকূল জলবায়ু, বিস্তৃত উর্বর প্লাবনভূমি, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ বাজার, সরকারি নীতি প্রভৃতি নিয়ামক কৃষির অনুকূল থাকায় বিভিন্ন ধরনের ফসল সহজেই চাষাবাদ করা যায়। উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, গম, পাট, চা, ইক্ষু, পশুপালন, মৎস্য চাষ অন্যতম। কৃষিতে সনাতন পদ্ধতির প্রাধান্য থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। জমিচাষের জন্য ট্রাক্টর, সেচের জন্য যন্ত্রপাতি, ফসল কাটার জন্য হারভেস্ট মেশিন, সার ও কীটনাশক ছিটানোর জন্য যন্ত্রপাতি, ফসল সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণাগার প্রভৃতি ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষির উন্নয়নের জন্য সরকার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে। এসকল প্রতিষ্ঠান কৃষির উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের গবেষণা, উদ্ভাবিত জাত কৃষকের নিকট পৌঁছানো, কৃষির সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের উপায় বের করাসহ প্রাসঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং সরকারি প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনে সক্ষম করে তুলেছে। এই ইউনিটে বাংলাদেশের প্রধান কৃষি উৎপাদিত পণ্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ : বাংলাদেশের কৃষি ও বিভিন্ন সংস্থা
পাঠ-৬.২ : ধান
পাঠ-৬.৩ : গম
পাঠ-৬.৪ : ভুট্টা
পাঠ-৬.৫ : পাট
পাঠ-৬.৬ : চা
পাঠ-৬.৭ : ইক্ষু
পাঠ-৬-৮: পশুপালন
পাঠ-৬.৯: মৎস্য চাষ
পাঠ-৬.১০: কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি

পাঠ-৬.১ বাংলাদেশের কৃষি ও বিভিন্ন সংস্থা (Agriculture of Bangladesh and Related Organization)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের কৃষির ধরণ ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- কৃষির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থার কার্যাবলি সম্পর্কে জানবেন।

বাংলাদেশের কৃষি

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম প্রধান উপায় কৃষি। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির বৃহত্তম খাত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ১৫.৬৫ শতাংশ। এদেশের কৃষির প্রধান লক্ষ্য বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠির খাদ্য চাহিদা পূরণের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, জনগণের পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। একইসাথে সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কৃষি উন্নয়নে কাজ করছে।

বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব : কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। এদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হওয়ায় কৃষিই অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি, কর্মসংস্থান এবং বেশকিছু শিল্পের কাঁচামালও সরবরাহ করে থাকে কৃষি। এছাড়া দারিদ্র দূরীকরণ, গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্বসমূহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো।

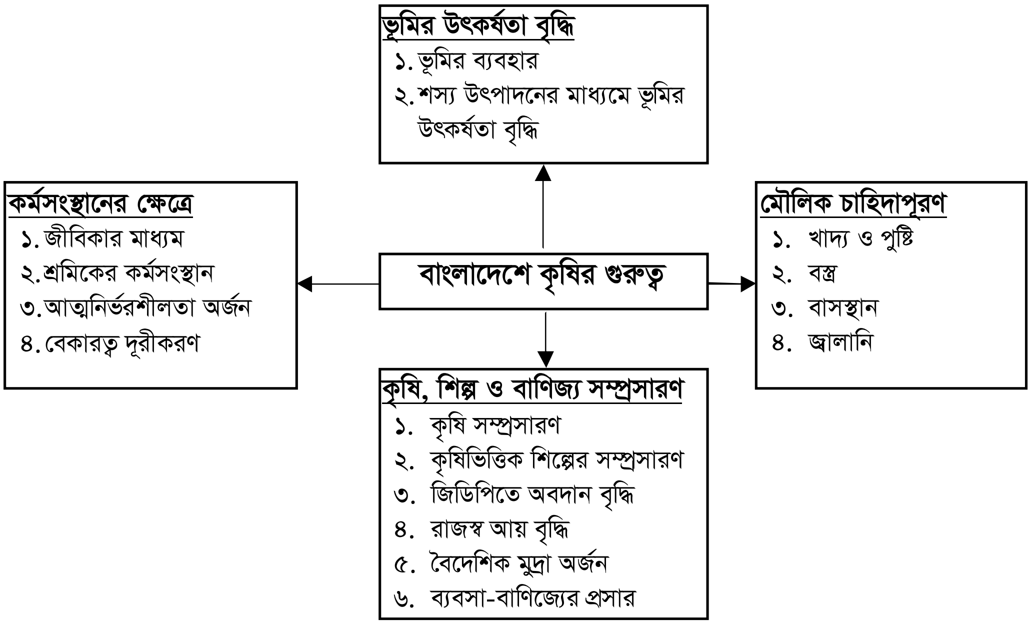

বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি সংস্থা : বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (Department of Agricultural Extension-DAE) : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সর্ববৃহৎ। ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা একীভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে এই অধিদপ্তর বিভাগীয়

কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৃষি সম্প্রসারণের বিভিন্ন কাজ যেমন-কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা এ অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংস্থাটি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের নিকট পৌঁছাতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত।

২. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (Bangladesh Agricultural Development Corporation-BADC): কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। সংস্থাটি কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা প্রদানের জন্য এ সংস্থাটির কার্যালয় উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। সংস্থাটির মূল কাজ হলো বিভিন্ন ফসলের বীজ সংরক্ষণ ও সরবরাহ, পানিসেচ প্রদান, ফসল সংরক্ষণ ও সরবরাহ, সার সরবরাহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করা। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

৩. বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Livestock Research Institute-BLRI): প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি ঢাকার সাভারে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানটি পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের জাত উদ্ভাবন, খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রাণির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করে থাকে। ইনস্টিটিউটটি প্রাণিজ উপকরণ ও প্রোডাক্টের ভ্যালু এডিশন, খামারি এবং উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান, প্রাণিসম্পদের আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন, পরীক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তির প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Agricultural Research Institute-BARI) : ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কৃষি সংস্থাটি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত। এই ইনস্টিটিউটটি দেশের বহুমুখী শস্যের গবেষণা করে থাকে। দানাশস্য, কন্দাল, ডাল, তৈলবীজ, সবজি, মসলা, ফল, ফুল ইত্যাদির জাত উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা করে থাকে। বিভিন্ন কৃষি ফসলের বীজ ও ফসল সম্পর্কে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন, রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধের কৌশল উদ্ভাবন, কীটনাশক প্রয়োগ, পানি এবং সেচ ব্যবস্থাপনা, খামার পদ্ধতির উন্নয়ন, কৃষির সাথে সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনসহ নানাবিধ কাজ করা এই সংস্থার প্রধান কাজ।

৫. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture-BINA) : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত স্বায়ত্তশাসিত এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতমানের অধিক ফলনশীল ধান, পাট, ডাল, তেলবীজ, সবজি জাতীয় শস্যের জাত উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত জাতসমূহের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো, ছাত্রছাত্রীদের কৃষি গবেষণায় পরমাণু শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষাদানসহ কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

৬. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Rice Research Institute-BRRI) : ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটটি স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটির ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ হলো ধান নিয়ে গবেষণা করা। নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান উদ্ভাবন, রোগ নির্ণয়, মৃত্তিকার ধরণ অনুযায়ী ধানের জাত উদ্ভাবন, পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ধান রক্ষার প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সার ব্যবহারের পরিমাণ নির্ধারণ, শস্য সংগ্রহের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর করা, প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে।

৭. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Jute Research Institute-BJRI) : প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকার শের-এ-বাংলা নগরে অবস্থিত। একসময়ের 'সোনালী আঁশ' খ্যাত পাটের নতুন জাত উদ্ভাবন, রোগ নির্ণয় এবং দমন কৌশল উদ্ভাবন প্রধান কাজ। সম্প্রতি বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম এর নেতৃত্বে এই সংস্থাটি পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করে বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছে বাংলাদেশ।

৮. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Sugarcrop Research Institute-BSRI) : বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় পাবনা জেলার ইশ্বরদীতে অবস্থিত। এর মূল কাজ ইক্ষুর জাত ও উন্নত উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত জাত ও কলাকৌশলসমূহ ইক্ষু চাষীদের নিকট পৌঁছানো।

৯. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Tea Research Institute-BTRI) : প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৭ সাল চা গবেষণা স্টেশন নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করা হয়। এর প্রধান কার্যালয় মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায়। ইনস্টিটিউটটির ৪টি উপকেন্দ্র রয়েছে। চায়ের গুণগত মান বৃদ্ধি, উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, চায়ের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় বের করা, চা চাষের সম্ভাবনাময় এলাকা চিহ্নিতকরণ, গবেষণালব্ধ প্রযুক্তির বিস্তার করা প্রধান কাজ। প্রতিষ্ঠানটি ১৮টি (BT ১ থেকে BT ১৮ পর্যন্ত) উচ্চফলনশীল চায়ের জাত উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া ডিপ্লোমা কোর্স, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন করে।

১০. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (Soil Resource Development Institute-SRDI) : কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গবেষণা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ১৯৮৩ সালে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট নামে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। এর কার্যালয় ঢাকার ফার্মগেটে অবস্থিত। মৃত্তিকার সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস, ব্যবস্থাপনা, গুণাগুণভিত্তিক শস্য নির্ধারণ, শস্য উৎপাদনের জন্য টেকসই পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং মৃত্তিকার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নির্দেশিকা প্রণয়ন প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

১১. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Fisheries Research Institute-BFRI) : ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। মৎস্য সম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫টি গবেষণা কেন্দ্র এবং ৫টি গবেষণা উপকেন্দ্র রয়েছে। উন্নত মৎস্য চাষ ও সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা, মৎস্য সম্পদের জাত উন্নয়ন, মৎস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ প্রদান, জলজ জীব সম্পদের উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার সম্পর্কিত মৌলিক ও ফলিত গবেষণা পরিচালনা করা প্রধান কাজ।

১২. বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (Seed Certification Agency-SCA) : ১৯৭৪ সালে বীজ অনুমোদন সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৬ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী নামকরণ করা হয়। এর প্রধান কার্যালয় গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে। এটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। সংস্থাটির মূল দায়িত্ব হলো সকল ধরনের বীজের অনুমোদিত জাতসমূহের প্রত্যয়ন প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণ করা। কৃষিতে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৩. কৃষি তথ্য সেবা (Agriculture Information Service-AIS) : ১৯৬১ কৃষি তথ্য সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮০ সালে কৃষি তথ্য সার্ভিস নামকরণ করা হয়। এর সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকায় অবস্থিত। কৃষি সংক্রান্ত সব ধরনের সেবা পেতে কৃষি তথ্য সেবা নামক এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংস্থাটি জন্মলগ্ন থেকে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবন হয়েছে কিনা, কোন এলাকায় কী ধরনের ফসল উৎপাদন বা বিপণন ব্যবস্থার ধরণ, ফসলের কোন রোগের জন্য কী প্রতিরোধ ব্যবস্থা, নতুন চাষাবাদ পদ্ধতিসহ কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য এ সংস্থার মাধ্যমে জানা যায়। এর ফলে কৃষক সহজেই কৃষি সংক্রান্ত বিষয়গুলো জেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions) : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শের-এ-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কৃষি বিষয়ক জ্ঞান বিস্তার এবং গবেষণা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি, উন্নত ফসলের জাত, টেকসই প্রযুক্তি, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা কৃষকের কাছে পৌঁছে দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে।

১৫. গণমাধ্যম ও মোবাইল ফোন (Mass Media and Mobile Phone) : সরকারি ও বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন, সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যম কৃষি বিষয়ক খবর ও তথ্য প্রচার করে থাকে। এসকল গণমাধ্যম কৃষি বিষয়ক তথ্য ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেও কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রাপ্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যা দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে।

১৬. অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (Other Institutions) : উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ইনস্টিটিউট, বন গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কৃষি উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের প্রতিষ্ঠানগুলোর পূর্ণরূপ ও অবস্থান লিখুন।

প্রতিষ্ঠানের নাম	পূর্ণরূপ	প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান
BADC		
BINA		
DAE		
SCA		
BRRI		

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে সরকার অনেকগুলো সাধারণ ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান উন্নতমানের বীজ উদ্ভাবন, উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ নির্ণয় ও দমন কৌশল উদ্ভাবন, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন, গবেষণা, প্রশিক্ষণসহ কৃষির উন্নয়নে কাজ করে থাকে। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, প্রাণি সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট অন্যতম। এছাড়া কৃষি বিষয়ক অন্যান্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কৃষির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের পেশা কোনটির সাথে সম্পৃক্ত?

(ক) শিল্প-কারখানা (খ) কৃষি (গ) চিকিৎসা (ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য

২। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?

(ক) ঢাকা (খ) রাজশাহী (গ) সিলেট (ঘ) চট্টগ্রাম

৩। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ক) ১৯৭২ (খ) ১৯৭৩ (গ) ১৯৭৪ (ঘ) ১৯৭৫

৪। বাংলাদেশের কৃষি ভূমিকা রাখে-

i. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ii. খাদ্য চাহিদা পূরণে iii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশের নদীবিধৌত প্লাবন সমভূমি খুবই উর্বর। তবে কোন মাটিতে কোন ফসল ভালো উৎপাদিত হতে পারে তা গবেষণার জন্য সরকার একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে।

৫। উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির নাম কী?

(ক) SRDI (খ) BINA (গ) DAE (ঘ) BRRI

৬। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো মৃত্তিকার -

i. সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করা

ii. গুণাগুণভিত্তিক শস্য নির্ধারণ

iii. সর্বোত্তম ব্যবহারের নির্দেশিকা প্রণয়ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.২ ধান (Paddy)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে ধান চাষের নিয়ামকসমূহ জানবেন;
- উৎপাদিত ধানের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ধান উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলসমূহের নাম বলতে পারবেন।

ধান

বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ধান থেকে প্রস্তুতকৃত চাল। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুগত অবস্থা, ভূ-প্রকৃতি ধান চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এখানকার মানুষ অভ্যাসগতভাবেই হোক আর প্রকৃতিগত কারণেই হোক না কেন ধানকে প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। দেশে উৎপাদিত ধান খাদ্য সরবরাহের অন্যতম প্রধান উৎস। কিন্তু ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ করা স্বল্প আয়তনের এ দেশে কঠিন হলেও কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি তা সম্ভব করেছে। তবে এতে ভূমির টেকসই ধারণ ক্ষমতার উপর চাপ পড়ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ৩৭টি উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে ৩১টি (বি আর ১-৩১ পর্যন্ত) বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন (BRRI) করেছে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ৫টি এবং গণচীনের ১টি জাতের ধান বাংলাদেশে চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত জাতসমূহের মধ্যে রয়েছে চান্দিনা, বিপ্লব, ত্রিশাইল, মুক্তা, সুফলা ইত্যাদি।

ধান চাষের নিয়ামকসমূহ : ধান চাষের জন্য কতিপয় প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত নিয়ামক রয়েছে। নিম্নে এসব নিয়ামক বর্ণনা করা হলোঃ

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক : নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিস্তৃত পলিযুক্ত সমভূমি ধান চাষের জন্য খুবই উপযোগী। শুধুমাত্র পাহাড়ি এলাকাসমূহে ধান চাষ প্রায় অসম্ভব। এদেশের অনুকূল জলবায়ু অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক : ধান চাষের আর্থ-সামাজিক নিয়ামকসমূহের মধ্যে রয়েছে শ্রমিক, মূলধন, স্থানীয় বাজার, পরিবহন প্রভৃতি। এসব নিয়ামক অনুকূল থাকায় প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয়।

গ. প্রযুক্তিগত নিয়ামক : ধান চাষে এখনও অনেকেই সনাতনী পদ্ধতি ব্যবহার করায় হেক্টর প্রতি উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় হেক্টর প্রতি উৎপাদন ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে দেশের জনসংখ্যা অধিক হলেও ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

ধানের প্রকারভেদ : বাংলাদেশের কৃষির একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ধানভিত্তিক কৃষি। এদেশের উর্বর মৃত্তিকার প্রায় সর্বত্র ধান উৎপাদিত হয় (চিত্র ৬.২.১)। এদেশে প্রধানত তিন ধরনের ধান উৎপদিত হয়। যথা– আউশ, আমন এবং বোরো। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

১. আউশ ধান : আউশ কথাটি মূলত বাংলা 'আশু' শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে বলে ধারণা করা হয়। এ ধান বপন এবং ফসল কাটার মধ্যবর্তী সময় তুলনামূলক কম বলে একে আউশ ধান নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে এ ধান বপন করা হয় এবং জুন-জুলাই মাসে কাটা হয়। এ ধানের একটি বিশেষ দিক বা বৈশিষ্ট্য হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। যেমন- প্রায় সময়ে গাছ বৃদ্ধির সময় খরা এবং ফসল কাটার সময় বন্যা হওয়া। অন্যান্য ধানের তুলনায় আউশ ধানের ফলন কম। পূর্বে আউশ ধানের যেসব জাত চাষ করা হতো সেগুলো এখন আর হয় না বললেই চলে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীলজাত চান্দিনা, মালা, সুফলা, মোহিনী, আশা প্রভৃতি চাষ করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। আউশ ধানের অধিকাংশ জাতের চাল মোটা এবং বাদামী। তবে সরু ও সাদা চালের আউশ ধানও কিছু কিছু রয়েছে। সারণি ৬.২.১ এ আউশ ধানের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ ও উৎপাদন দেখানো হয়েছে।

২. আমন ধান : আমন শব্দটি আরবি যার বাংলা অর্থ নিরাপদ। আমন ধানের মৌসুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ কম বলে এ নামকরণ করা হয়েছে। এ ধান প্রধানত নিচু জমিতে চাষ করা হয়। বর্ষাকালে যেসব জমি প্লাবিত হয় সেসব জমিতে আমন ধান ভালো উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জমিতে আমন ধান আবাদ করা হয় (সারণি ৬.২.১)। আমাদের দেশে সাধারণত দুই ধরনের আমন ধান চাষ করা হয়। যথা- রোপা আমন এবং ছিটা আমন।

ক. রোপা আমন : যে আমন ধানের বীজতলায় আলাদাভাবে চারা গজিয়ে ৪/৫ সপ্তাহ পর তা উঠিয়ে আবার কর্দমাক্ত জমিতে রোপন করা হয় তাকে রোপা আমন বলে। এ ধান অধিক পরিমাণ জমিতে চাষ করা হয়। রোপা আমন ধানের জাতের মধ্যে রয়েছে রাজাশাইল, ডিএ-৩১, নাইজার শাইল, কার্তিক শাইল প্রভৃতি। এসব জাতের মধ্যে বর্তমানে কেবল নাইজার শাইল ধান চাষ হয়। আর উন্নত জাতসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো বিপ্লব, ব্রিশাইল, দিশারি, নয়াপাজাম, পাজাম, ব্রি ধান ৩০, ব্রি ধান ৩১ ইত্যাদি।

সারণি ৬.২.১ : বিভিন্ন প্রকার ধানের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন

অর্থবছর	আউশ		আমন		বোরো	
	জমির পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপাদন (লক্ষ টন)	জমির পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপাদন (লক্ষ টন)	জমির পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপাদন (লক্ষ টন)
২০১১-১২	২৮.১২	২৩.৩২	১৩৭.৮৯	১২৭.৯৮	১১৮.৮৬	১৮৭.৫৯
২০১২-১৩	২৬.০২	২১.৫৮	১৩৮.৬৩	১২৮.৯৭	১২৭.৬৩	১১৭.৭৮
২০১৩-১৪	২৫.৯৮	২৩.২৬	১৩৬.৬৬	১৩০.২৩	১১৮.৩৭	১৯০.০৭
২০১৪-১৫	২৫.৮৩	২৩.২৮	১৩৬.৫০	১৩১.৯০	১১৯.৬১	১৯১.৯২
২০১৫-১৬	২৫.১৬	২২.৮১	১৩৮.১৪	১৩৪.৮৩	১১৭.৯৪	১৮৯.৩৭

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ (পৃ. ২৪৭)

খ. ছিটা আমন : আউশ ধানের মতো ছিটিয়ে বপন করে যে আমন ধানের চাষ করা হয় তাই হলো ছিটা আমন। গভীর পানিতে উৎপন্ন হয় বলে এ ধানকে জলী আমন ধানও বলা হয়ে থাকে। কার্তিক-অগ্রহায়ন মাসে এ ধান কাটা হয়। ছিটা আমন ধানের জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে গাবুরা, কাটিয়া, বাগদার, গদালবি, দুদলাকি ইত্যাদি।

বোরো ধান : বাংলাদেশে শীতের মৌসুমে যে ধান চাষ করা হয় তাই বোরো ধান। বর্ষাকালের শেষে নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়সহ নিম্নাঞ্চল থেকে যখন পানি সরে যায় তখন এ ধান চাষ করা হয় এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে কাটা হয়। রোপা আমন ধানের মতো বীজতলা থেকে চারা উঠিয়ে এ ধান রোপন করা হয়। এ ধান চাষের জন্য পানি সেচ আবশ্যকীয় উপাদান। বোরো ধানের উৎপাদন অন্যান্য ধানের তুলনায় অনেক বেশি। সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলা বোরো ধান উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চল। অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদিত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পানি সেচের মাধ্যমে বোরো ধানের চাষ করা হয়। এতে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হয়। সারণি ৬.২.১ এ বোরো আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ ও উৎপাদন দেখানো হয়েছে।

ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল : বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই ধান উৎপাদিত হয়। তবে রংপুর, দিনাজপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, বগুড়া, ঢাকা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি

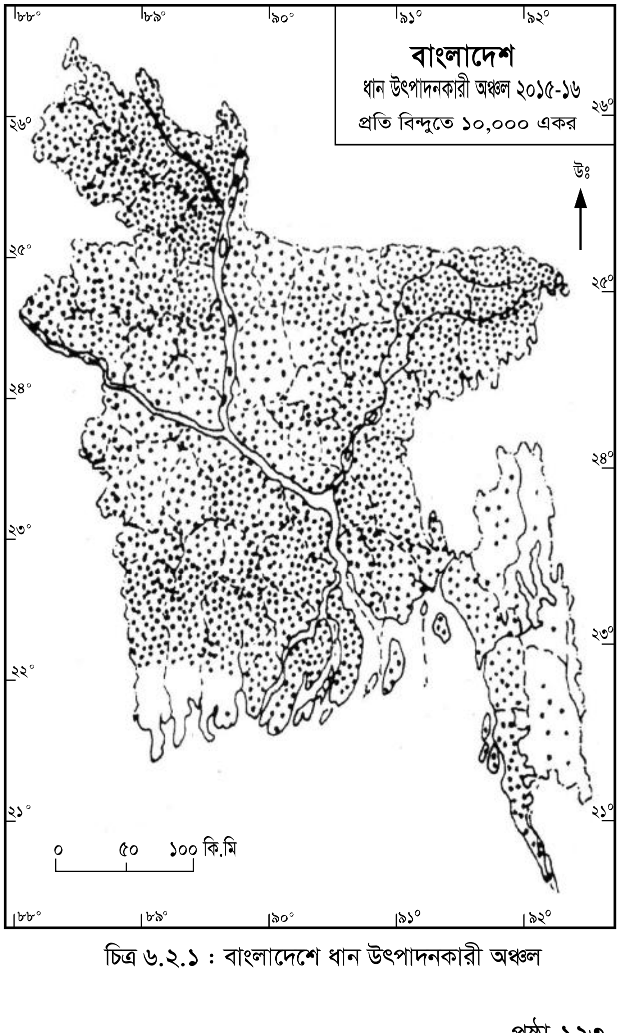

চিত্র ৬.২.১ : বাংলাদেশে ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল

জেলায় অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয়। উৎপাদনের দিক থেকে বৃহত্তর রংপুর প্রথম, রাজশাহী দ্বিতীয়, কুমিল্লা তৃতীয় এবং সিলেট চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। আর উৎপাদিত ধানের প্রকারভেদ অনুযায়ী আউশ ধান উৎপাদনে বৃহত্তর যশোর প্রথম, সিলেট দ্বিতীয় এবং কুমিল্লা তৃতীয়। আমন ধান উৎপাদনে বৃহত্তর রংপুর প্রথম, দিনাজপুর দ্বিতীয় এবং রাজশাহী তৃতীয়। বোরো ধান উৎপাদনে বৃহত্তর কুমিল্লা প্রথম, কিশোরগঞ্জ দ্বিতীয় এবং ঢাকা তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

চালের বাণিজ্য : বাংলাদেশে উৎপাদিত ধান দেশের অভ্যন্তরীণ চালের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাম্পার ফলন, বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সন্তোষজনক মজুদ থাকায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকার প্রথমবারের মতো ২৫ হাজার টন মোটা চাল শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি করেছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে সামান্য পরিমাণে সুগন্ধি চাল রপ্তানি করা হয়। সারণি ৬.২.২ এ বিগত কয়েক বছরের চাল আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দেখানো হলো।

সারণি ৬.২.২ : চাল আমদানি ব্যয়

অর্থবছর	আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন ডলার)
২০১১-১২	২৮৮
২০১২-১৩	৩০
২০১৩-১৪	৩৪৭
২০১৪-১৫	৫০৮
২০১৫-১৬	১১২

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ (পৃ. ৩০১)

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের ধান উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলসমূহ মানচিত্রে দেখান।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধান থেকে তৈরি চাল। এদেশের অনুকূল জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, সুলভ শ্রমিক এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক নিয়ামক অনুকূল থাকায় প্রায় সর্বত্রই ধান উৎপাদিত হয়। আউশ, আমন এবং বোরো এই তিন ধরনের ধান বছরের বিভিন্ন সময়ে উৎপাদন করা হয়। সনাতন জাতের ধান চাষের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল ধান এদেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে ভূমিকা পালন করছে। উচ্চফলনশীল জাতের ধান উৎপাদনের পাশাপাশি দেশি জাতের ধানের চাষ অব্যাহত রেখে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে যা টেকসই উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য কী?
(ক) যব (খ) ভুট্টা (গ) গম (ঘ) ধান

২। বাংলাদেশে বর্তমানে কতটি উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ হচ্ছে?
(ক) ৩০টি (খ) ৩৭টি (গ) ৪৪টি (ঘ) ৫১টি

৩। আমন ধানের জাত হলো-
i. ব্রিশাইল ii. চান্দিনা iii. রাজাশাইল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
আমাদের দেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। এটি দেশের প্রায় সর্বত্র উৎপাদিত হয়। কৃষি শ্রমিকের একটি বড় অংশ এই খাদ্যশস্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত।

৪। বাংলাদেশে প্রধানত কত প্রকারের ধান উৎপাদিত হয়?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঙ) পাঁচ

৫। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত ধানের জাত হলো -
i. চান্দিনা ii. মুক্তা iii. সুফলা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৩ গম (Wheat)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গম চাষের নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে জানবেন;
- বাংলাদেশে চাষকৃত গমের জাতসমূহ বলতে পারবেন এবং
- গমের উৎপাদন ও বন্টন বর্ণনা করতে পারবেন।

গম

বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের পরেই গমের অবস্থান। এটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। এদেশে শীতকালে গম চাষ করায় বন্যা কিংবা খরায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে গমের বীজ বপন করা হয় এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে কাটা হয়। গমের খাদ্যমান ধানের চেয়ে ভালো। সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই ভাতের পরিবর্তে গমের রুটি খেতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকে। মূলত শারীরিক গঠন ঠিক রাখার জন্যই গমের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গম চাষের নিয়ামক : গম চাষের জন্য কতকগুলো প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত নিয়ামক প্রয়োজন। এসব নিয়ামক আবাদের জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে গম চাষের নিয়ামকসমূহ উল্লেখ করা হলো।

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক : গম চাষের প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহের রয়েছে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা প্রভৃতি। গমের চারা বৃদ্ধির সময় আর্দ্র ও শীতল এবং পাকার সময় উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন। সাধারণত উচু ও মাঝারি জমি গম চাষের উপযুক্ত। দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মৃত্তিকা গম চাষের জন্য সর্বোত্তম।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক : গম চাষের আর্থ-সামাজিক নিয়ামকসমূহের মধ্যে মূলধন, শ্রমিক, স্থানীয় চাহিদা, সুষ্ঠু ও সহজলভ্য পরিবহন ব্যবস্থা, সরকারি নীতি অন্যতম। এ সকল নিয়ামক অনুকূল থাকায় বিশেষ করে স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গমের আবাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. প্রযুক্তিগত নিয়ামক : গমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। আমাদের দেশে গম চাষে সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত জাত : পূর্বে 'পোষা' (Pusha) নামক এক জাতীয় গমের চাষ করা হতো। সোনারো-৬৪, ইনিয়া-৬৬, নরটোনা-৬৭, টেনোরী-৭১, সোনালিকা, কল্যাণসোনা জাতসমূহ জাতীয় বীজ উন্নয়ন বোর্ড চাষের অনুমোদন দিয়েছে। দেশে বর্তমানে উচ্চফলনশীল বলাকা, দোয়েল, সোনালিকা, জুপাটেকো, আনন্দ, পাভন-৭৬, কাঞ্চন, বরকত, আকবর, অঘ্রনী প্রভৃতি জাতের গম চাষ হচ্ছে। গম চাষের ক্ষেত্রে উচ্চফলনশীল বীজ নির্বাচন করার সময় তিনটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। এগুলো হলো- বীজ বপনের সময়, সেচ-ব্যবস্থা এবং ঢেলাযুক্ত জমিতে বীজ বপন। বাংলাদেশের স্বল্পকালীন শীত ঋতুতে সঠিক সময়ে গম চাষের উপর পর্যাপ্ত উৎপাদন নির্ভর করে। গমের জাতভেদে বপনের সময়ের কিছুটা তারতম্য হতে পারে। তবে কার্তিক হতে মধ্য অগ্রহায়ন পর্যন্ত বীজ বপনের উৎকৃষ্ট সময়। দেরিতে বীজ বপন করলে উৎপাদন কম হয়। কারণ শীত কমে গেলে দানা গঠন এবং পুষ্টতায় ব্যাঘাত ঘটে এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

গম উৎপাদনকারী অঞ্চল ও উৎপাদন : বাংলাদেশে গমের তৈরি খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ছে। পার্বত্য অঞ্চল ব্যতিত দেশের প্রায় সর্বত্রই গমের চাষ করা হয় (চিত্র ৬.৩.১)। তবে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে অধিক পরিমাণে গম উৎপাদিত হয়। গম উৎপাদনকারী জেলাগুলোর মধ্যে দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও যশোর অন্যতম। এছাড়া কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও খুলনা জেলাতেও গমের আবাদ ভালো হয়। বর্তমানে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে গম চাষ সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

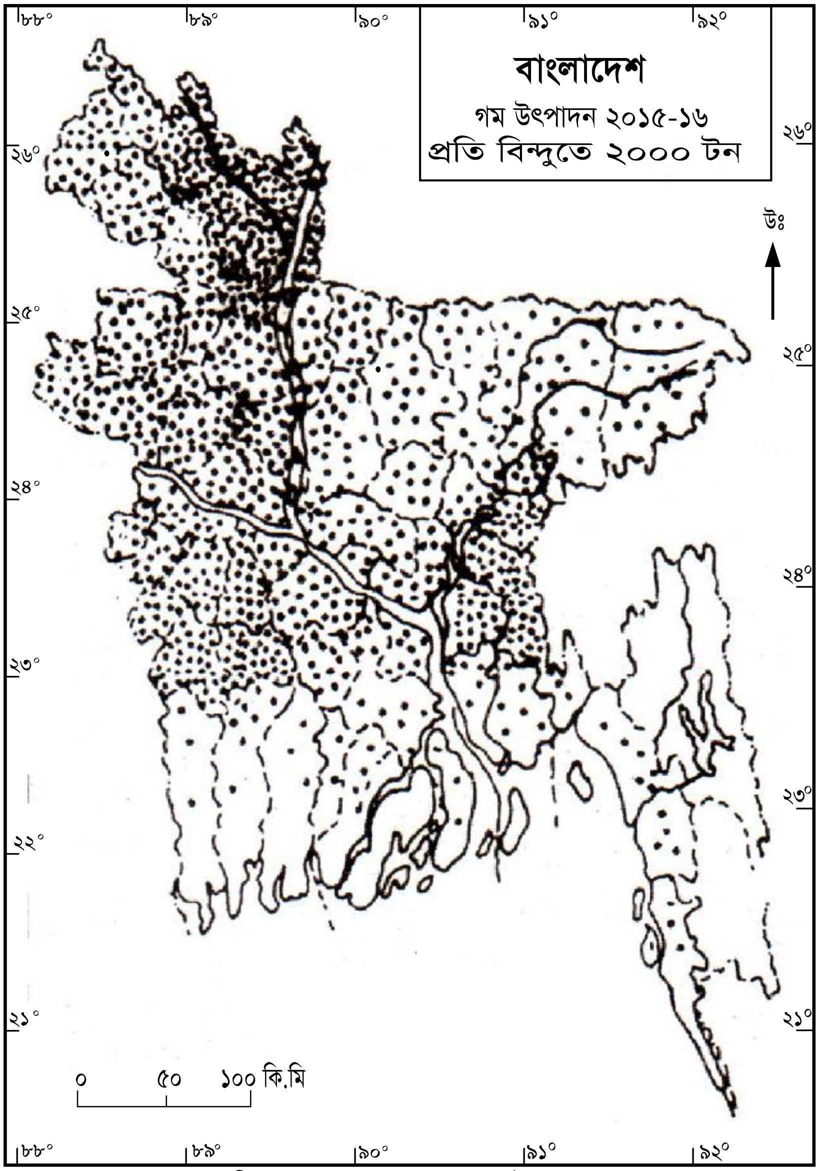

চিত্র ৬.২.১ : বাংলাদেশে গমের উৎপাদন

সারণি ৬.৩.১ অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে ৮.৮৫ লক্ষ একর জমিতে ৯.৯৫ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হয়। যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০.৯৯ লক্ষ একর জমিতে ১৩.৪৮ লক্ষ টন দাঁড়িয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে একর প্রতি গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১.২৩ টন যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ১.১২ টন।

সারণি ৬.৩.১: বাংলাদেশে গম চাষের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

অর্থবছর	জমির পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপাদন (লক্ষ টন)	একর প্রতি উৎপাদন (টন)
২০১১-১২	৮.৮৫	৯.৯৫	১.১২
২০১২-১৩	১০.২৯	১২.৫৫	১.২২
২০১৩-১৪	১০.৬২	১৩.০৩	১.২৩
২০১৪-১৫	১০.৭৯	১৩.৪৮	১.২৫
২০১৫-১৬	১০.৯৯	১৩.৪৮	১.২৩

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ (পৃ. ২৪৭)

গমের বাণিজ্য : বাংলাদেশ গম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। চাহিদার তুলনায় গম চাষের পরিমাণ কম হওয়ায় প্রতিবছর গম আমদানি করতে হয়। গমের তৈরি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানির পরিমাণও বাড়ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৬. ৬১ লক্ষ টন গম আমদানি করা হয়। যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪২.৮০ লক্ষ টন এ দাঁড়িয়েছে। সারণি ৬.৩.২ এ বিগত কয়েক বছরের গম আমদানি ব্যয় উল্লেখ করা হলো। বাংলাদেশ সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে গম আমদানি করে থাকে।

সারণি ৬.৩.২: গম আমদানি ব্যয়

অর্থবছর	পরিমাণ (মিলিয়ন ডলার)
২০১১-১২	৬১৩
২০১২-১৩	৬৯৬
২০১৩-১৪	১১১৮
২০১৪-১৫	৯৮৩
২০১৫-১৬	৯৪৫

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ (পৃ. ৩০১)

শিক্ষার্থীর কাজ	গম থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্যসমূহের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের পরেই গমের অবস্থান। এদেশে শীতকালে গম চাষ করা হয়। গমের তৈরি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা এবং উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গম উৎপাদনকারী জেলাসমূহের মধ্যে দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর অন্যতম। এছাড়া দেশের অন্যান্য জেলাতেও কম-বেশি গম উৎপাদিত হয়। দেশে উৎপাদিত গম দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ না হওয়ায় প্রতিবছর গম আমদানি করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলাদেশ গম আমদানি করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৩.৪৮ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হয় এবং ৪২.৮০ লক্ষ টন গম আমদানি করা হয়। উৎপাদিত গমের তুলনায় অধিক পরিমাণে আমদানি করতে হয় বলে চাষের জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের মানুষের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য কোনটি?
(ক) ধান (খ) ভুট্টা (গ) গম (ঘ) যব

২। গম উৎপাদনকারী জেলা-
i. দিনাজপুর ii. রাজশাহী iii. খাগড়াছড়ি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কত একর জমিতে গম চাষ করা হয়?
(ক) ৮.৮৫ লক্ষ (খ) ১০.২৯ লক্ষ (গ) ১০.৬২ লক্ষ (ঘ) ১০.৯৯ লক্ষ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ভূগোল বিষয়ক টিউটোরিয়াল ক্লাসের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা জানতে পারলেন যে, আমাদের দেশে গমের তৈরি খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীরা নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য গম চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

৪। কোনটি গমের জাতের অন্তর্ভুক্ত?
i. বলাকা ii. দোয়েল iii. চান্দিনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কী পরিমাণ গম আমদানি করা হয়?
(ক) ২৬.৭৭ লক্ষ মে. টন (খ) ৩০.৩৩ লক্ষ মে. টন (গ) ৩৮.৪১ লক্ষ মে. টন (ঘ) ৪২.৮০ লক্ষ মে. টন

পাঠ-৬.৪ ভুট্টা (Maize)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভুট্টা চাষের নিয়ামকসমূহ জানবেন এবং
- ভুট্টার উৎপাদন ও ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

ভুট্টা

বাংলাদেশের একটি অপ্রচলিত খাদ্যশস্য ভুট্টা। এটি Graminae পরিবারভুক্ত ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ এবং বৈজ্ঞানিক নাম Zeamays। ভুট্টা বর্ষজীবী দণ্ডাকার নরম কাণ্ডবিশিষ্ট এবং আখের পাতার ন্যায় লম্বা ও সরু পত্রযুক্ত একবীজপত্রী উদ্ভিদ। মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোতে ভুট্টার উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশেও অনেক আগে ভুট্টার চাষ প্রবর্তিত হয়েছে। তবে সে তুলনায় এর ব্যবহার এবং আবাদ তেমন বৃদ্ধি পায়নি। ভুট্টার প্রতি গাছে সাধারণত একটি করে মোচা হয়। তবে কোনো কোনো গাছে দুইটি মোচাও হতে পারে। আবার কখনো কখনো তিনটি মোচাও হতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো মোচাই ভালো হয় না। এ অবস্থায় দুইটি মোচা রেখে বাকিগুলো ফেলে দেওয়া ভালো। ভুট্টার মোচায় দানাগুলো লম্বালম্বি সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে।

ভুট্টা চাষের নিয়ামক : ভুট্টা চাষের জন্য কতকগুলো প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক নিয়ামক প্রয়োজন। নিম্নে এসব নিয়ামক উল্লেখ করা হলো:

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক

১. জলবায়ু : গ্রীষ্মকালীন জলবায়ুতে অর্থাৎ উষ্ণ আবহাওয়ায় ভুট্টা ভালো জন্মে। এটি চাষের জন্য ২১° সেলসিয়াস থেকে ২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫ থেকে ৪০ ইঞ্চি আবশ্যক হলেও ১৫০ থেকে ২০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতেও ভুট্টা জন্মাতে পারে।

২. মৃত্তিকা : ভুট্টা চাষের জন্য দোঁআশ মৃত্তিকা সর্বোত্তম। এছাড়া গভীর পলিমাটি ও লাল দোঁআশ মৃত্তিকাতেও ভুট্টা ভালো জন্মে। এটি অম্লাত্মক থেকে ক্ষারাত্মক উভয় প্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মাতে পারে। বাংলাদেশের মধুপুর অঞ্চলের লাল মৃত্তিকা ভুট্টা চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক

১. বাজার : যেকোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ বাজার প্রয়োজন। আমাদের দেশে ভুট্টার প্রবর্তন অনেক আগে হলেও এর চাষভুক্ত জমি ও বাজার তেমন সম্প্রসারিত হয়নি। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভুট্টার বাজার প্রসারিত হতে শুরু করায় এর আবাদের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. মূলধন : ভুট্টা চাষের জমি প্রস্তুতকরণ, বীজ ক্রয়, বাজারজাতকরণ প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন থাকতে হয়। তবে এর জন্য খুব বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয়না। স্বল্প মূলধনে ভুট্টা চাষ করা যায় বলে যে কেউ আবাদ করতে পারে।

৩. শ্রমিক : ভুট্টা চাষের জন্য খুব বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে সুলভে শ্রমিক থাকায় ভুট্টা চাষ সম্প্রসারণের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

ভুট্টার জাত : বাংলাদেশে ভুট্টা চাষে বিভিন্ন জাত ব্যবহার করা হয়। সাধারণত বিদেশ থেকে যখন যে জাতের ভুট্টার বীজ পাওয়া যায় তাই চাষ করা হয়। আমাদের দেশে সুইট ও পপকর্ণ চাষ হতে দেখা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিপাইনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্র হতে সংগৃহীত বেশ কিছু জাত উপযোগী বলে জাতীয় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এসব জাতসমূহের মধ্যে রয়েছে শুভ্রা, বর্ণালি, মোহর প্রভৃতি।

ভুট্টা উৎপাদনকারী অঞ্চল ও উৎপাদন : বাংলাদেশে ভুট্টা উৎপাদনের দিক থেকে মধুপুর অঞ্চল প্রথম। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম পদ্ধতিতে চাষবাদের সাথে বোজা, মাখী ও বিন্নি এই তিন ধরনের ভুট্টা চাষ করা হয়। রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা,

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়াসহ দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় সামান্য পরিমাণে ভুট্টা চাষ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২২.৭২ লক্ষ টন ভুট্টা উৎপাদিত হয় যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ১০.১৮ লক্ষ টন। সারণি ৬.৪.১ এ ভুট্টা চাষের জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৪.১: ভুট্টা চাষের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

অর্থবছর	জমির পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপাদন (লক্ষ টন)
২০১০-১১	৪.০৯	১০.১৮
২০১১-১২	৪.৮৭	১২.৯৮
২০১২-১৩	৫.৮০	১৫.৪৮
২০১৩-১৪	৭.৫৯	২১.২৪
২০১৪-১৫	৮.০৪	২২.৭২

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০১৫ (পৃ. ১৪৫)

ভুট্টার ব্যবহার : ভুট্টার দানা মানুষ এবং প্রাণি উভয়ের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভুট্টার শক্তদানা থেকে আটা তৈরি করে রুটি ও বিস্কুট প্রস্তুত করা হয় এবং পপকর্ণ থেকে খই ভাজা হয়। এছাড়া কর্ণ ফ্লেকস্ তৈরি করে দুধ ও চিনি মিশিয়ে নাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভুট্টা দানার শর্করা থেকে গ্লুকোজ ও ডেক্সট্রিন প্রস্তুত করা হয়। ভুট্টার দানা থেকে একপ্রকার ভোজ্য তেলও প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে ভুট্টার কচি দানা আগুনে ঝলসিয়ে খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভুট্টা থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্যসমূহের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ভুট্টা বাংলাদেশের একটি অপ্রচলিত খাদ্যশস্য। এর ব্যবহার এবং উৎপাদন উভয়ই কম। টাঙ্গাইল, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়াসহ দেশের প্রায় সকল জেলাতেই সামান্য পরিমাণে ভুট্টা উৎপাদিত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভুট্টার উৎপাদন এবং ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেড়েছে। ভুট্টার আবাদ জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভুট্টা চাষের জন্য কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন?

(ক) ২১°-২৭° সে. (খ) ২৭°-৩৪° সে. (গ) ২১°-৩৪° সে. (ঘ) ২৭°-৩৮° সে.

২। আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?

(ক) জাপান (খ) ফিলিপাইন (গ) জার্মানি (ঘ) কোরিয়া

৩। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কত টন ভুট্টা উৎপাদিত হয়?

(ক) ২২.৭২ লক্ষ (খ) ২৩.৭২ লক্ষ (গ) ২৪.৭২ লক্ষ (ঘ) ২৫.৭২ লক্ষ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আমাদের দেশের একটি অপ্রচলিত খাদ্যশস্য ভুট্টা। এটি Graminac পরিবারভুক্ত ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ।

৪। ভুট্টা গাছে সাধারণত কতটি মোচা হয়?

(ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

৫। ভুট্টা থেকে প্রস্তুত করা হয়-

i. কর্ণ ফ্লেকস ii. গ্লুকোজ iii. রুটি, বিস্কুট

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৫ পাট (Jute)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পাট চাষের নিয়ামকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল ও উৎপাদন সম্পর্কে জানবেন এবং
- পাটের ব্যবহার ও বাণিজ্য বলতে পারবেন।

পাট

সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দ থেকে পাট শব্দটি এসেছে। পাটের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Jute', যা উড়িয়া শব্দ 'ঝুটে' (Jhoute) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এটি টিলিয়াসি (Tiliaceae) পরিবারভুক্ত সরু দণ্ডাকৃতির ডালপালাবিহীন বর্ষজীবি তন্তু জাতীয় উদ্ভিদ। পাট বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল যা একসময় 'সোনালী আঁশ' নামে খ্যাত ছিল। এদেশে উৎপাদিত পাট অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের। দেশে-বিদেশে পাটের তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদা এ শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পাট চাষের নিয়ামকসমূহ : পাট চাষের নিয়ামকসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত। নিম্নে এসব নিয়ামক বর্ণনা করা হলো:

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক

১. জলবায়ু : পাট চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু আবশ্যক। সাধারণত ২১°-২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ১৫০-২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত পাট চাষের জন্য উপযুক্ত। পাট চাষের জন্য পানির সান্নিধ্য একান্ত প্রয়োজন। এদেশের অনুকূল জলবায়ু পাট উৎপাদনে বাংলাদেশকে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় দেশে আসীন করেছে।

২. মৃত্তিকা : পাট চাষের জন্য দোআঁশ মৃত্তিকা প্রয়োজন। নদীবাহিত পলিযুক্ত মৃত্তিকা পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এ ধরনের মৃত্তিকা স্বভাবতই অত্যন্ত উর্বর। এছাড়া বেলে-দোঁআশ মৃত্তিকাতেও পাট ভালো জন্মে। বাংলাদেশের নদীবিধৌত পলিমাটিতে উৎকৃষ্টমানের পাট জন্মে।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক

১. শ্রমিক : বাংলাদেশে শ্রমিক সস্তা এবং সুলভ হওয়ায় পাট চাষের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাট চাষের জন্য জমি প্রস্তুতকরণ, বীজ বপন, পরিচর্যা, পাট কাটা, জাগ দেয়া, ধোঁয়া এবং শুকানোর জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক আবশ্যক। এছাড়া পাটকলে প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হয়।

২. মূলধন : পাট চাষের জমি প্রস্তুতকরণ, বীজ সংগ্রহ, সার ও কীটনাশক ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতির জন্য মূলধনের প্রয়োজন হয়। তবে পাট চাষে স্বল্প খরচ হওয়ায় খুব বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না।

৩. বাজার : পাটজাত পণ্যের পর্যাপ্ত বাজার থাকতে হয়। এদেশে তৈরি পাটের বিভিন্ন আকর্ষণীয় পণ্যসামগ্রীর দেশে-বিদেশে ব্যাপক চাহিদা থাকায় অধিকাংশ কৃষকই পাট চাষ করে থাকে।

৪. পরিবহন ও যোগাযোগ : পাট প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য সুলভ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আবশ্যক।

৫. কারখানা : পাটজাত পণ্য তৈরির জন্য পর্যাপ্ত কারখানা আবশ্যক যা এই শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্প খরচে মানসম্পন্ন পণ্য নিশ্চিতের জন্য আধুনিক উন্নতমানের কারখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬. বীজ, সার ও কীটনাশক : ভালোমানের পাট চাষের জন্য সময়মতো উন্নত বীজ ও পর্যাপ্ত সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। এছাড়া রোগ-বালাই দমনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণগতমানসম্পন্ন কীটনাশক আবশ্যক।

গ. প্রযুক্তিগত নিয়ামক : পাট চাষ আধুনিকীকরণের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন। পাট চাষের জমি প্রস্তুতে ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পাটের জাত : বাংলাদেশে দুই প্রজাতির পাটের চাষ হয়। যথা-দেশি পাট এবং তোষা পাট। বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (BJRI) কর্তৃক অনুমোদিত দেশি পাট ও তোষা পাটের জাতসমূহের মধ্যে রয়েছে-

দেশি পাটের জাত : বিজেআরআই দেশি-১ (ডি-১৫৪), বিজেআরআই দেশি-২ (সিভিএল-১), বিজেআরআই দেশি-৩ (সিভিআই-৩), বিজেআরআই দেশি-৪ (সিসি-৪৫), বিজেআরআই দেশি-৫ (বিজেসি ৭৩৭০), বিজেআরআই-৬ (বিজেসি-৮৩), বিনা দেশি পাট-২, এটম পাট-৩৮ প্রভৃতি।

তোষা পাটের জাত : বিজেআরআই তোষা-১ (ও-৪), বিজেআরআই তোষা-২ (ও-৯৮৯৭), বিজেআরআই তোষা-৩ (ওএস-১), বিজেআরআই তোষা-৪ (ও-৭২) ইত্যাদি।

পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল ও উৎপাদন : বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই পাট চাষ হয় (চিত্র ৬.৫.১)। তন্মধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয়। বর্তমানে পাট উৎপাদনে অঞ্চল হিসেবে বৃহত্তর রংপুর প্রথম স্থানে, ফরিদপুর অঞ্চল দ্বিতীয় স্থানে, যশোর অঞ্চল তৃতীয় স্থানে এবং কুষ্টিয়া অঞ্চল চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামে পাটের চাষ নেই বললেই চলে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৮.৭৮ লক্ষ একর জমিতে ১৮.৭৮ লক্ষ টন পাট উৎপন্ন হয়। যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দাঁড়ায় ১৬.৭৫ লক্ষ একর জমিতে ৭৫.৫৯ লক্ষ টন। সারণি ৬.৫.১ এ বিগত কয়েক বছরের পাট চাষের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন দেখানো হলো।

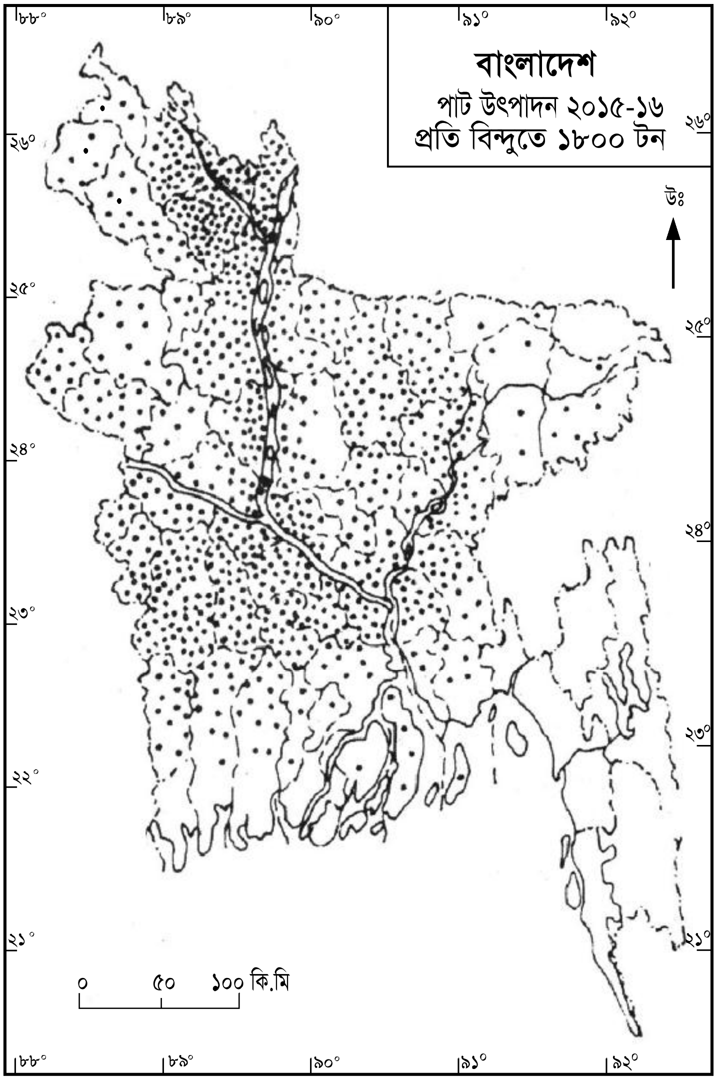

চিত্র ৬.৫.১ : বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন

পাটের বাণিজ্য : একসময় পাট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান অর্থকরী ফসল হলেও বর্তমানে অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ থেকে কাঁচাপাট এবং পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। সাধারণত ভারত, পাকিস্তান, সিংগাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়। সারণি ৬.৫.২ এ পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৫.১: পাট চাষাধীন জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন

অর্থবছর	জমির পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপাদন (লক্ষ টন)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (টন)
২০১১-১২	১৮.৭৮	১৮.৭৮	১.০০
২০১২-১৩	১৬.৮৩	১৩.৮১	০.৮২
২০১৩-১৪	১৬.৪৫	৭৪.৩৬	৪.৫২
২০১৪-১৫	১৬.৬২	৭৫.০১	৪.৫১
২০১৫-১৬	১৬.৭৫	৭৫.৫৯	৪.৫১

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ২৪৭)

সারণি ৬.৫.২: পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি আয়

অর্থবছর	রপ্তানির আয় (মিলিয়ন ডলার)		মোট	রপ্তানি আয়ের অংশ (%)
	কাঁচাপাট	পাটজাত পণ্য		
২০১১-১২	২৬৬	৭০১	৯৬৭	৩.৯৮
২০১২-১৩	২৩০	৮০১	১০৩১	৩.৮১
২০১৩-১৪	১২৬	৬৯৯	৮২৫	২.৭৩
২০১৪-১৫	১১২	৭৫৭	৮৬৯	২.৭৮
২০১৫-১৬	১৭৩	৭৪৭	৯২০	২.৬০

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ (পৃ. ২৯৯)

পাটের ব্যবহার : পাট থেকে প্রস্তুতকৃত পণ্যসামগ্রী পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় সারাবিশ্বে সমাদৃত। পাটের তৈরি পণ্যসামগ্রী সহজে নষ্ট হয় না এবং টেকসই। পাট থেকে সুতা, থলে বা বস্তা, ব্যাগ, দড়ি, কাপড়, গালিচা, কৃত্রিম পশম, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি সিকিয়া একসময় গ্রামীণ এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। পাটকাঠি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়াও ঘর ও ক্ষেতের বেড়া তৈরির জন্য কাজে লাগে এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎকৃষ্টমানের কাগজ, হার্ডবোর্ড প্রভৃতি তৈরি করা যায়। এছাড়া কচি পাট শাক হিসেবে বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সরকার পাটের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হলো- পাটের জেনম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক গবেষণা, উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় নিরূপন, পাট চাষের সম্ভাবনাময় এলাকা চিহ্নিতকরণ, রিবন রেটিং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, বন্ধ পাটকল চালু করা, নতুন পাটকল স্থাপন, পাটের তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি, নির্ধারিত কয়েকটি পণ্যে পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা, বিভিন্ন সভা-সেমিনারে পাটের তৈরি সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যাগ প্রদান প্রভৃতি। পাটের তৈরি পরিবেশবান্ধব জিনিসপত্র ব্যবহারে নিজে সচেতন হতে হবে এবং অন্যকেও সচেতন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাট থেকে প্রস্তুত পণ্যসামগ্রীগুলোর নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

পাট বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলসমূহের মধ্যে অন্যতম। এদেশের অনুকূলে জলবায়ু, উর্বর মৃত্তিকা, পর্যাপ্ত পানি, সুলভ শ্রমিক প্রভৃতি এ শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের প্রায় সর্বত্র পাট উৎপাদিত হলেও রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, জামালপুর, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। দেশে-বিদেশে পাটজাত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা থাকায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একসময় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পাট শীর্ষে থাকলে বর্তমানে অন্যান্য খাতের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে পাটজাত পণ্য ও কাঁচাপাট রপ্তানি করে ৯৬৭ মিলিয়ন ডলার আয় করে যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৯২০ মিলিয়ন ডলার। পাটজাত পণ্য পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় এর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধিতে সবাইকে সচেতন হতে হবে যা পরিবেশের টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাট চাষের জন্য সাধারণত কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন?
(ক) ২১°-২৭° সে. (খ) ৩১°-৩৭° সে. (গ) ৩১°-৪১° সে (ঘ) ৪১°-৪৭° সে

২। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কত টন পাট উৎপন্ন হয়?
(ক) ৭৩.৮১ লক্ষ (খ) ৭৪.৩৬ লক্ষ (গ) ৭৫.৫৯ লক্ষ (ঘ) ৭৬.০১ লক্ষ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

এক সময়ের ‘সোনালী আঁশ’ খ্যাত একটি কৃষিজ কৃষকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতো। একই সাথে এটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উপায় ছিল। অতীতের সেই গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৩। নিচের কোনটি ‘সোনালী আঁশ’ নামে পরিচিত?
(ক) ধান (খ) ডাল (গ) রেশম (ঘ) পাট

৪। উদ্দীপকে আলোচ্য কৃষিজ ফসলটি থেকে প্রস্তুত করা হয়–
i. থলে ii. চিনি iii. কাগজ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৬ চা (Tea)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে চা চাষের নিয়ামকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- চা উৎপাদনকারী অঞ্চল ও উৎপাদন জানবেন এবং
- চা এর আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

চা

চা বাংলাদেশের মানুষের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয়। প্রায় সব বয়সের মানুষ এটি পান করে থাকে। নিজে এবং আতিথেয়তায় চা পান করানো বাঙালি সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের অর্থকরী কৃষিজ ফসলসমূহের মধ্যে অন্যতম। চা চাষে এদেশ বেশ উন্নতি লাভ করেছে এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে প্রথম চায়ের চারা রোপন করা হয় ১৮৪০ সালে বর্তমানে যেখানে চট্টগ্রাম ক্লাব অবস্থিত। তবে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম চা চাষ শুরু হয় ১৯৫৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায়। পরবর্তীতে সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় চা চাষের বিস্তার ঘটে। এছাড়া প্রায় ১৪৩ বছর পর ২০০০ সালে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পঞ্চগড় জেলায় চা চাষ শুরু হয়।

চা চাষের নিয়ামকসমূহ : বাংলাদেশে চা চাষের বিকাশে কতকগুলো প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক নিয়ামক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। নিম্নে এ সকল নিয়ামকসমূহ বর্ণনা করা হলো-

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক

১. জলবায়ু : চা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় চা চাষের অনুকূল তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত থাকায় চা বাগানগুলো গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সমতল ভূমিতেও চা চাষ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে মার্চ-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চা চাষের অনুকূল জলবায়ু থাকায় এ সময় চা পাতা উৎপাদিত হয়।

২. মৃত্তিকা : চা চাষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়ামক মৃত্তিকা। মৃত্তিকার গুণাগুণের উপর চায়ের উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল। উর্বর লৌহ ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত দোঁআশ মৃত্তিকা চা চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের এ ধরনের গুণাগুণ সম্পন্ন মৃত্তিকা চা চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এছাড়া দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হিমালয়ের পাদদেশীয় পলল সমভূমির বিস্তৃত অঞ্চল চা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এখানকার মৃত্তিকার রং বাদামী থেকে কালচে এবং বুনট বালি-পাথর-কাকর মিশ্রিত। চা চাষের জন্য মৃত্তিকার অম্লীয়মান ৪.৫-৫.৮ এর মধ্যে থাকা আবশ্যক।

৩. ভূ-প্রকৃতি : চা গাছের জন্য যেমন পানি প্রয়োজন তেমনি গোড়ায় পানি জমে থাকলে গাছ মরে যায়। এ কারণে উত্তম পানি নিষ্কাশন বিশিষ্ট ঢালু জমিতে চা চাষ করা হয়। দেশের পাহাড়ি অঞ্চলের ঢালে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত থাকায় চা বাগান গড়ে উঠেছে। এছাড়া দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নিম্নভূমি ছাড়া বৃষ্টির পানি স্থায়ী হয় না। এ কারণে অপেক্ষাকৃত উচু জমি চা চাষের জন্য উপযুক্ত হওয়ায় চা এর আবাদ শুরু হয়েছে।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক

১. শ্রমিক : চা চাষে প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন। অর্থাৎ অন্যান্য কৃষি উৎপাদনের তুলনায় চা শ্রমঘন হিসেবে পরিচিত। চায়ের জমি প্রস্তুত, চারা লাগানো, পরিচর্যা, পাতা তোলা, পাতা প্রক্রিয়াজাত করাসহ বিভিন্ন কাজে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। চা পাতা তোলার জন্য সবচেয়ে বেশি শ্রমিক বিশেষ করে নারী শ্রমিক প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের চা বাগানের শ্রমিকদের আদি নিবাস ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। এসব শ্রমিক আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য থেকে সংগ্রহ করে চা চাষ শুরু করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্থানীয় শ্রমিকদের দিয়ে চা আবাদ শুরু হয়েছে এবং এখানে স্থানীয় শ্রমিকরাই চা বাগানে দক্ষতার সাথে কাজ করছে।

২. মূলধন : চা চাষের জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চা বাগানগুলোর জমি সরকারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানপূর্বক লিজ নিলেও অর্থাৎ জমি ক্রয় করতে না হলেও শ্রমিকের মজুরি, বাগান পরিচর্যা, সার ও কীটনাশক ক্রয়, কারখানা স্থাপন, শ্রমিক ও কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণ প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা প্রয়োজনে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করতে পারে যা এই শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখে। তবে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে উঠা চা বাগানগুলোর জমি উদ্যোক্তারা নিজেই ক্রয় করে বাগান শুরু করেছে যা এই শিল্পের প্রতি উদ্যোক্তাগণের আগ্রহের বহি:প্রকাশ এবং সরকারি প্রচেষ্টার সুফল হিসেবে মনে করা হয়।

৩. বাজার : বাংলাদেশে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বিদেশেও বাংলাদেশী চায়ের চাহিদা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অর্গানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত চা দেশে-বিদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যা বৈদেশিক বাণিজ্যে চা শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

৪. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা : চা চাষের সরঞ্জাম, পাতা পরিবহন এবং প্রস্তুতকৃত চা নিলামে প্রেরণের জন্য সুলভ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আবশ্যক। এছাড়া বিদেশে চা রপ্তানির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর অনুকূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে।

৫. সার ও কীটনাশক : চা পাতার উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৃত্তিকার পুষ্টিমান বজায় রাখার জন্য সময়মতো পর্যাপ্ত সার প্রয়োজন। এছাড়া রোগ-বালাই দমনের জন্য মানসম্মত কীটনাশক সরবরাহ আবশ্যকীয় নিয়ামক।

৬. সরকারি নীতি : চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারের শিল্পবান্ধব নীতি আবশ্যক। সরকারের নীতি চা শিল্পের বিকাশ এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।

গ. প্রযুক্তিগত নিয়ামক : বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি চায়ের উৎপাদন অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় কম। তাই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। একইসাথে প্রযুক্তি সহজলভ্য করতে হবে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন খরচ কমে যাবে। এতে চা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং অর্থনীতিতে অবদান বৃদ্ধি পাবে।

চা উৎপাদনকারী অঞ্চল : বাংলাদেশের অধিকাংশ চা বাগান উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় চা বাগান অবস্থিত (চিত্র ৬.৬.১)। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চা বাগানগুলো পাহাড়ি এলাকায় গড়ে উঠলেও উত্তর-

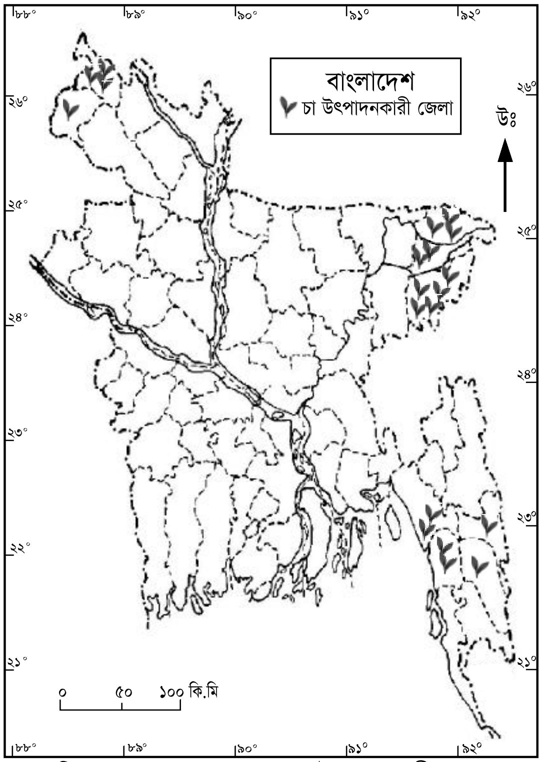

চিত্র ৬.৬.১ : বাংলাদেশের চা উৎপাদনকারী জেলা

পশ্চিমাঞ্চলের চা বাগানগুলো সমতল ভূমিতে গড়ে উঠেছে। এছাড়াও বাংলাদেশে ক্ষুদ্র পর্যায়েও চা চাষ শুরু হয়েছে। ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা বাগান গড়ে উঠেছে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, বান্দরবান প্রভৃতি জেলায়। আরো নতুন নতুন জেলায় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ চা বাগান গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সারণি ৬.৬.১ এ বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক চা বাগানের সংখ্যা দেখানো হয়েছে।

সারণি ৬.৬.১ : বাংলাদেশে চা বাগানের সংখ্যা

জেলার নাম	বাগান সংখ্যা
মৌলভীবাজার	৯০টি
সিলেট	১৮টি
হবিগঞ্জ	২৩টি
চট্টগ্রাম	২১টি
রাঙামাটি	১টি
পঞ্চগড়	৮টি
ঠাকুরগাঁও	১টি
মোট	**১৬২টি**

উৎস: বাংলাদেশ চা বোর্ড, ২০১৭

চা এর উৎপাদন : বাংলাদেশ চা উৎপাদনে বিশ্বে নবম। চা এর আবাদ শুরুর পর থেকে শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চা উৎপাদিত হলেও ২০০৩ সাল থেকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সমতলভূমির উৎপাদিত চা যুক্ত হতে থাকে (চা চাষ শুরু ২০০০ সালে)। ফলে ধারাবাহিকভাবে এদেশের চা উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১২ সালে ৫৪,৫০০ হেক্টর জমিতে ৬২.৫২ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয় যা ২০১৬ সালে ৫৯,০১৮ হেক্টর জমিতে ৮৫.০৫ মিলিয়ন কেজিতে পৌঁছাছে। সারণি ৬.৬.২ এ বিগত কয়েক বছরের চা চাষের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন ধারা দেখানো হলো।

সারণি ৬.৬.২ : বিগত কয়েক বছরের চা চাষের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

সাল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)	উৎপাদন (কেজি/হেক্টর)
২০১২	৫৪,৫০০	৬২.৫২	১২৫২
২০১৩	৫৯,১৩৫	৬৬.২৬	১৩২০
২০১৪	৫৯,৬০৯	৬৩.৮৮	১২৩০
২০১৫	৫৯,০১৮	৬৭.৩৮	১২৭০
২০১৬	৫৯,০১৮	৮৫.০৫	১৫৮৭

উৎস: বাংলাদেশ চা বোর্ড-২০১৭

চা এর বাণিজ্য : পূর্বে বাংলাদেশের চা শিল্প অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে স্বয়ংসম্পন্ন ছিল। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে চা বিদেশে রপ্তানি করা হতো যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উপায় ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে রপ্তানির পরিমাণ একেবারে কমে গেছে। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, জার্মানি প্রভৃতি দেশে চা রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশ চা রপ্তানিকারক দেশ হলেও সাম্প্রতিক সময়ে অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া দেশে উৎপাদিত চায়ের ঘ্রাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সামান্য পরিমাণে উৎকৃষ্ট মানের চা আমদানি করা হয় যা দেশীয় চায়ের সাথে মিশানো হয়। সারণি ৬.৩.৩ এ বাংলাদেশের চা রপ্তানি ও আমদানির চিত্র দেখানো হলো।

সারণি ৬.৩.৩ : বাংলাদেশের চা রপ্তানি ও আমদানির চিত্র

সাল	রপ্তানি (মিলিয়ন কেজি)	আমদানি (মিলিয়ন কেজি)
২০১২	১.৫৬	১.৯২
২০১৩	০.৫৪	১০.৬২
২০১৪	২.৬৬	৬.৯৬
২০১৫	০.৫৫	১১.৪০
২০১৬	০.৫১	৭.৭০

উৎস: বাংলাদেশ চা বোর্ড -২০১৭

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ চা আমদানি করলেও এটি একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। পুরাতন চা গাছসমূহ তুলে ফেলে পুনঃরোপন, সঠিক পরিচর্যা, উন্নতমানের চারা বা বীজ রোপন, সময়মতো সার, কীটনাশক ও সেচ নিশ্চিত করা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কল-কারখানার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করেও পর্যাপ্ত পরিমাণে চা রপ্তানি করা সম্ভব যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের চা উৎপাদনকারী জেলাসমূহ মানচিত্রে চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলসমূহের মধ্যে অন্যতম চা। এ শিল্পের বিকাশে ভূ-প্রকৃতি, অনুকূল জলবায়ু, পানি নিষ্কাশনযুক্ত পাহাড়ি মৃত্তিকা, পর্যাপ্ত শ্রমিক, মূলধন, অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাজার, সুলভ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ চা বাগান উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় গড়ে উঠেছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও জেলায় বৃহৎ চা বাগান গড়ে উঠেছে। এছাড়া এ অঞ্চলের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও জেলা ছাড়াও লালমনিরহাট, নীলফামারী প্রভৃতি জেলায় ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ শুরু হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পূর্বে চা বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি পণ্য হিসেবে সুপরিচিত থাকলেও বর্তমানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমদানি করতে হয়। এ কারণে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের বহুমুখী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রথম চা বাগান কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) ১৮৪৭ (খ) ১৮৫৭ (গ) ১৮৬৭ (ঘ) ১৮৭৭

২। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ কী পরিমাণ চা রপ্তানি করেছে?
(ক) ০.৫১ মিলিয়ন কেজি (খ) ১.১০ মিলিয়ন কেজি (গ) ১.৫১ মিলিয়ন কেজি (ঘ) ১.৬৫ মিলিয়ন কেজি

৩। বাংলাদেশে কোন জেলায় প্রথম ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ শুরু হয়?
(ক) পঞ্চগড় (খ) রাঙামাটি (গ)সিলেট (ঘ) হবিগঞ্জ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশের মানুষের একটি জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে পরিচিত চা। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় চা উৎপাদিত হলেও সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সমতলভূমিতে চা চাষ শুরু হয়েছে।

৪। বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি চা বাগান রয়েছে?
(ক) ১৫৮টি (খ) ১৬০টি (গ) ১৬২টি (ঘ) ১৬৪টি

৫। চা উৎপাদনকারী জেলা হলো–
i. মৌলভীবাজার ii. সিলেট iii. পঞ্চগড়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৭ ইক্ষু (Sugarcane)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইক্ষু চাষের নিয়ামকসমূহ বলতে পারবেন এবং
- ইক্ষুর উৎপাদনকারী অঞ্চল ও উৎপাদন বর্ণনা করতে পারবেন।

ইক্ষু

ইক্ষু বা আখ Graminee পরিবারভুক্ত ঘাসজাতীয় দণ্ডাকৃতির ডালপালাহীন একবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। ভারতীয় উপমহাদেশ ইক্ষুর আদি ভূমি হিসেবে পরিচিত। এটি ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের এক ধরনের বাণিজ্যিক ফসল। বাংলাদেশেরও অন্যতম অর্থকরী ফসল। এটি চিনি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় একে শিল্পজ ফসলও বলা হয়।

ইক্ষু চাষের নিয়ামক : ইক্ষু চাষের প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত নিয়ামকসমূহ নিম্নরূপ-

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক

১. জলবায়ু : ইক্ষু চাষের জন্য গ্রীষ্ম ও অগ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু উপযোগী। অধিক গরম বা অধিক ঠান্ডা উভয়ই ইক্ষুর জন্য ক্ষতিকর। ইক্ষু চাষের জন্য দৈনিক গড়ে ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা সর্বোত্তম এবং ১৭৮-২০২ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত ভালো।

২. মৃত্তিকা : এঁটেল, দোঁআশ এবং এঁটেল-দোআঁশ মৃত্তিকা ইক্ষু চাষের জন্য উৎকৃষ্ট। তবে গভীর পলিমাটিতেও ইক্ষু ভালো জন্মে। এটি চাষের জমি উঁচু এবং সমতল হওয়া আবশ্যক। মৃত্তিকার পিএইচ মান ৬.০-৭.৫ এর মধ্যে থাকা ভালো।

৩. পানি নিষ্কাশন : নিচু জমি যেখানে পানি সহজে জমে যায় এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো নয় সেখানে ইক্ষু চাষের উপযোগী নয়। এজন্য উত্তম পানি নিষ্কাশনযুক্ত জমি ইক্ষু চাষের জন্য নির্বাচন করতে হয়।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক

১. শ্রমিক : ইক্ষু চাষের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক আবশ্যক। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত শ্রমিক সুলভে পাওয়া যায়, যা ইক্ষু চাষের জন্য সহায়ক নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

২. মূলধন : ইক্ষু চাষের জমি প্রস্তুতকরণ, সার, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি, পরিবহন প্রভৃতির জন্য পর্যাপ্ত মূলধন প্রয়োজন।

৩. বাজার : ইক্ষু থেকে প্রস্তুতকৃত চিনি বা গুড়ের পর্যাপ্ত বাজার থাকতে হয়। চাহিদা ভালো থাকলে ভালো মূল্য পাওয়া যায়। আমাদের দেশে চিনি বা গুড়ের পর্যাপ্ত চাহিদা ইক্ষু চাষের অনুকূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

৪. সঠিক ব্যবস্থাপনা : ইক্ষু শিল্পের যথাযথ বিকাশের জন্য জমি প্রস্তুত থেকে শুরু করে কারখানায় প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে চিনি বা গুড় উৎপাদন করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর এর সাফল্য নিহিত।

গ. প্রযুক্তিগত নিয়ামক : ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি এবং উন্নতমানের কারখানা স্থাপন করে ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের আগ্রহী করে তোলা যায়।

ইক্ষুর প্রকারভেদ : বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের ইক্ষু উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত ইক্ষুর মধ্যে দুইশ আট গেণ্ডারি, ঘাকড়ি প্রধান। দুইশ আট গেণ্ডারি উৎকৃষ্টমানের ইক্ষু যাতে প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বিভিন্ন জাতের উচ্চফলনশীল ইক্ষু উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে ইক্ষুর ৩৭টি জাত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো-ঈশ্বরদী ১/৫৫, ঈশ্বরদী ২/৫৪, ঈশ্বরদী ৫/৫৫, ঈশ্বরদী ৯/৫৫, ঈশ্বরদী-১৫।

ইক্ষু উৎপাদনকারী অঞ্চল ও উৎপাদন : বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কমবেশি ইক্ষু চাষ করা হয় (চিত্র ৬.৭.১)। এর মধ্যে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর প্রভৃতি জেলা ইক্ষু উৎপাদনে বিশেষ প্রসিদ্ধ হওয়ায় এগুলোকে একত্রে ‘ইক্ষু বলয়’ বলা হয়। এছাড়া-ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি জেলাতেও

প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু উৎপাদিত হয়। বিভাগ হিসেবে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে অধিক ইক্ষু উৎপাদিত হওয়ায় **১৮টি** চিনিকলের মধ্যে **১০টি** এ দুটি বিভাগে গড়ে উঠেছে। অন্যান্য ফসলের তুলনায় ইক্ষু অধিক লাভজনক হওয়ায় অনেকেই এ ফসল চাষে অধিক আগ্রহী। কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইক্ষু চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সারণি **৬.৭.১** এ ইক্ষু চাষাধীন জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন দেখানো হলো।

সারণি ৬.৭.১: ইক্ষু চাষাধীন জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন

অর্থবছর	জমির পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপাদন (লক্ষ টন)	টন/একর
২০১০-১১	২.৮৭	৪৬.৭১	১৬.২৭
২০১১-১২	২.৬৬	৪৬.০৩	১৭.৩০
২০১২-১৩	২.৬৯	৪৪.৬৮	১৬.৬১
২০১৩-১৪	২.৬৫	৪৫.০৮	১৭.০১
২০১৪-১৫	২.৬৫	৪৫.৭৯	১৭.২১

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬ (পৃ. ২৭৮)

সারণি ৬.৭.১ অনুযায়ী, বিগত কয়েক বছরে ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেয়েছে। তবে একর প্রতি গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার কারণে চিনি কলগুলো সার্বিকভাবে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা যায়না। ফলশ্রুতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি আমদানি করতে হয় ।

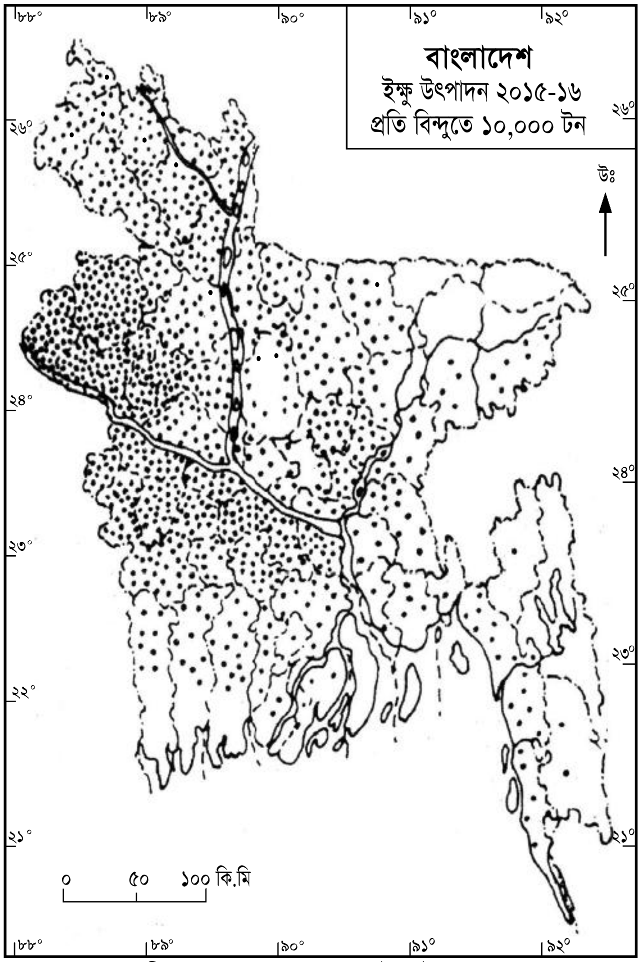

চিত্র ৬.৭.১ : বাংলাদেশের ইক্ষু উৎপাদন

ইক্ষুর বাণিজ্য : বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থাৎ রপ্তানিতে ইক্ষুর বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। দেশে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় কম। এ কারণে বিশ্ববাজার থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি আমদানি করতে হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬৭৫ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ১২.৯৮ লক্ষ টন চিনি আমদানি করা হয়। সারণি ৬.৭.১ এ চিনি আমদানির চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি ৬.৭.১ : চিনি আমদানির পরিমাণ

অর্থবছর	আমদানির পরিমাণ (লক্ষ টন)
২০১০-১১	১২.১৬
২০১১-১২	১৯.৮৮
২০১২-১৩	১৫.৭৩
২০১৩-১৪	১৭.২১
২০১৪-১৫	২০.৮৮

উৎস: বিবিএস, ২০১৬

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের ইক্ষু উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলসমূহের নাম লিখুন এবং মানচিত্রে চিহ্নিত করে দেখান।

সারসংক্ষেপ

ইক্ষু বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল যা থেকে চিনি বা গুড় প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত চিনি বা গুড় শর্করা জাতীয় খাদ্যের উৎস। এটি মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু যা দেহে শক্তি প্রদান করে থাকে। অনুকূল জলবায়ু, মৃত্তিকা, সুলভ শ্রমিক প্রভৃতি ইক্ষু চাষে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইক্ষু উৎপাদনকারী জেলাসমূহের মধ্যে রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর অন্যতম। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২.৬৫ লক্ষ একর জমিতে ৪৫.৭৯ লক্ষ টন ইক্ষু উৎপাদিত হয়। তবে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ায় প্রতিবছর চিনি আমদানি করতে হয়। তাই ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে সবাইকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চিনি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) ইক্ষু (খ) ভুট্টা (গ) তাল (ঘ) চীনাবাদাম

২। ইক্ষু চাষের জন্য উপযুক্ত মৃত্তিকা হলো−
i. এঁটেল ii. দোঁআশ iii. এঁটেল-দোঁআশ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে একর প্রতি কত টন ইক্ষু উৎপাদিত হয়?
(ক) ১৭.৩০ টন (খ) ১৬.৩১ টন (গ) ১৭.২১ টন (ঘ) ১৭.৪১ টন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
ইক্ষু ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের একটি বাণিজ্যিক ফসল। বাংলাদেশে উৎপাদিত এ ফসলটি অর্থকরী ফসল হিসেবে পরিচিত। তবে দেশের সর্বত্র সমানভাবে ইক্ষু উৎপাদিত হয়না।

৪। ইক্ষুর আদি ভূমি হিসেবে পরিচিত কোন অঞ্চলটি?
(ক) মধ্য এশিয়া (খ) ভারতীয় উপমহাদেশ (গ) মধ্যপ্রাচ্য (ঘ) ল্যাটিন আমেরিকা

৫। ইক্ষু বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো-
i. দিনাজপুর ii. সিলেট iii. যশোর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৮ পশুপালন (Animal Rearing)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পশুপালন বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের প্রধান প্রাণিসম্পদগুলো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পশুপালন

সাধারণভাবে পশুপালন বলতে গরু, ছাগল, মহিষ, উট, ভেড়া, ঘোড়া, দুম্বা, হাঁস, মুরগী, কবুতর, পাখি, কুমির প্রভৃতি পালনকে বুঝায়। বিশ্বের অনেক দেশেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যাপকভিত্তিক পশুপালন করা হয়। আমাদের দেশে মূলত অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য পশুপালন করা হয়। পশুপালনের মাধ্যমে মাংস, দুধ, ডিম, চামড়া, হাড় ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশুসম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পশুপালনের উদ্দেশ্য : পশুপালনের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো–

১. কৃষি কাজের জন্য (যেমন জমি চাষ) কৃষকেরা গরু, মহিষ পালন করে।
২. কৃষি সামগ্রী মাঠে আনা-নেয়ার জন্য গরু, মহিষ বা ঘোড়া ব্যবহার করা হয়।
৩. মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মুরগী, কবুতর পালন করা হয়।
৪. প্রধানত গরু পালনের মাধ্যমে দুধের চাহিদা মেটানো হয়। এছাড়া ছাগল এবং মহিষ পালন করেও দুধ পাওয়া যায়।
৫. ডিমের জন্য হাঁস, মুরগী, কোয়েল পালন করা হয়।
৬. অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য গরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মুরগীর খামার করা হয়।
৭. শখের বশে কুকুর, বিড়াল, বানরসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখিপালন প্রভৃতি।

বাংলাদেশের প্রধান প্রাণিসম্পদ : বিশ্বে অনেকগুলো প্রাণিপালনের আওতাভুক্ত হলেও বাংলাদেশে সব প্রাণি সমানভাবে পালন করা হয় না (সারণি ৬.৮.১)। এদেশের জলবায়ু এবং পরিবেশের উপযোগী উল্লেখযোগ্য যেসব প্রাণিপালন করা হয় নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো-

১. গরু : বাংলাদেশের গৃহপালিত প্রাণির মধ্যে গরুই প্রধান। প্রধানত দেশি জাতের গরু পালন করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উন্নত জাতের গরু পালনের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশি গরুর তুলনায় এসব উন্নত জাতের গরুর মাংস ও দুধ উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশি। ঢাকার সাভার, সিলেটের কাঁটাবাড়ি এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় আধুনিক ডেইরি ফার্ম গড়ে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি গরু পালিত হয় সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, রংপুর, ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা, ফরিদপুর, রাজশাহী, যশোর প্রভৃতি জেলায়। এছাড়া দেশের সর্বত্রই গরু পালন করা হয়। সাধারণত প্রায় প্রত্যেক কৃষকের ঘরে এক বা একাধিক গরু রয়েছে।

২. মহিষ : আমাদের দেশে গরুর তুলনায় মহিষ পালনের প্রবণতা কম। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মহিষের সংখ্যা ছিল ১৪.৭১ লক্ষ। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে বিশেষ করে পটুয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা প্রভৃতি জেলায় অধিক সংখ্যক মহিষ পালন করা হয়। এছাড়া দেশের অন্যান্য স্থানেও মহিষ পালন করা হয়। দেশি গরুর তুলনায় মহিষের মাংস এবং দুধ অধিক উৎপাদিত হয়।

৩. ছাগল : প্রধানত মাংস এবং চামড়ার জন্য ছাগল পালন করা হয়। ছাগল হতে সামান্য পরিমাণে দুধ পাওয়া যায়। রাজশাহী, কুমিল্লা, দিনাজপুর, যশোর প্রভৃতি জেলায় অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা হয়। এছাড়া দেশের প্রায় সর্বত্রই ছাগল পালন করা হয়। স্বল্প পুঁজিতে ছাগল পালন করে অনেকেই নিজের কর্মসংস্থান নিজেই করে যা আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে ছাগলের সংখ্যা ছিল ২৫৭.৬৬ লক্ষ।

৪. ভেড়া : বাংলাদেশে ভেড়া পালনের হার ছাগলের তুলনায় অনেক কম। ভেড়া শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলের প্রাণি হওয়ায় এদেশের জলবায়ুতে এর বিকাশ তেমন ঘটেনি। সাধারণত মাংস এবং চামড়ার জন্য ভেড়া পালন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ভেড়ার সংখ্যা ছিল ৩৩.৩৫ লক্ষ।

৫. মুরগী : গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে মুরগী পালন করতে দেখা যায়। মাংস এবং ডিমের জন্য মুরগী পালন করা হয় যা প্রায় সকলের প্রিয় খাদ্য। সাধারাণত গ্রামাঞ্চলে দেশি জাতের মুরগী পালন করা হয়। এছাড়া পর্যাপ্ত মাংস ও ডিম সরবরাহের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য পোল্ট্রি খামার গড়ে উঠেছে। এসব খামার কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬. হাঁস : বাংলাদেশের অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, ডোবা, জলাশয় রয়েছে যেখানে হাঁস পালন করা হয়। হাঁস পালনের জন্য পানির প্রয়োজন হয়। প্রধানত মাংস এবং ডিম উৎপাদনের জন্য হাঁস পালন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে হাঁসের সংখ্যা ছিল ৫২২.৪০ লক্ষ।

সারণি ৬.৮.১: বাংলাদেশের প্রধান প্রাণিসম্পদের সংখ্যা (লক্ষ)

প্রাণিসম্পদের নাম	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
গরু	২৩১.৯৫	২৩৩.৪১	২৩৪.৮৮	২৩৬.৩৬	২৩৭.১৬
মহিষ	১৪.৪৩	১৪.৫০	১৪.৫৭	১৪.৬৪	১৪.৭১
ছাগল	২৫১.১৬	২৫২.৭৬	২৫৪.৩৯	২৫৬.০২	২৫৭.৬৬
ভেড়া	৩০.৮২	৩১.৪৩	৩২.০৬	৩২.৭০	৩৩.৩৫
মুরগী	২৪২৮.৬৬	২৪৯০.০০	২৫৫৩.১১	২৬১৭.৭০	২৬৮৩.৯৩
হাঁস	৪৫৭.০০	৪৭২.৫৩	৪৮৮.৬১	৫০৫.২২	৫২২.৪০

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ৯৫)

দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন : বাংলাদেশে পালিত প্রাণিসম্পদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি দুধ, মাংস এবং ডিমের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ৬.৮.২ এ দুধ, মাংস এবং ডিম উৎপাদন দেখানো হলো।

সারণি ৬.৮.২: দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

অর্থবছর	দুধ (লক্ষ টন)	মাংস (লক্ষ টন)	ডিম (লক্ষ)
২০১১-১২	৩৪.৬৩	২৩.৩২	৭৩,০৩৮
২০১২-১৩	৫০.৬৭	৩৬.২০	৭৬,১৭৩
২০১৩-১৪	৬০.৯০	৪৫.২০	১,০১,৬৮০
২০১৪-১৫	৬৯.৭০	৫৮.৬০	১,০৯,৯৫২
২০১৫-১৬	৭২.৭৫	৬১.৫২	১,১৯,১২৪

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ৯৫)

প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের বিপুল পরিমাণ চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া প্রাণিসম্পদের (যেমন- গরু, মহিষের) চামড়া, হাড়, শিং প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পশুর বিষ্ঠা উৎকৃষ্ট জৈব সার। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদের অবদান ছিল ১.৬৬ শতাংশ। দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় সরকার এ খাতের উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। এ খাতের উন্নয়নে গৃহিত পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হলো-গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগীর বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়ন, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম প্রভৃতি। প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন, গবেষণা, সম্প্রসারণের জন্য ঢাকার সাভারে প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় যে সকল প্রাণিপালন করা হয় সেগুলো বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

মানুষের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস প্রাণিসম্পদ। এদেশের অনুকূল জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রাণিপালনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের পালিত প্রাণির মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী অন্যতম। দেশের সর্বত্রই কমবেশি এসব প্রাণি পালন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এসব প্রাণিপালন করে ৭২.৭৫ লক্ষ টন দুধ, ৬১.৫২ লক্ষ টন মাংস এবং ১,১৯,১২৪ লক্ষটি ডিম উৎপাদন করা হয়। প্রাণিসম্পদ খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম একটি উপখাত যা কর্মসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন প্রাণিটি বাংলাদেশে পালন করা হয়?
(ক) উট (খ) গরু (গ) দুম্বা (ঘ) মেষ

২। প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম (গ) সিরাজগঞ্জ (ঘ) রাজশাহী

৩। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণি সম্পদের অবদান কত ছিল?
(ক) ১.৬৬% (খ) ২.৬৬% (গ) ৩.৬৬% (ঘ) ৪.৬৬%

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি স্বল্প পুঁজিতে পালন করা যায় এবং আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

৪। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছাগলের সংখ্যা কত ছিল?
(ক) ২৫৭.৬৬ লক্ষ (খ) ২৬৮.৭৩ লক্ষ (গ) ২৭৭.৭৮ লক্ষ (ঘ) ২৮৭.৯০ লক্ষ

৫। ছাগল পালন করে পাওয়া যায়-
i. মাংস ii. দুধ iii. চামড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৯ মৎস্য চাষ (Pisciculture)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৎস্য চাষ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- মৎস্য চাষের নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে চাষকৃত মৎস্যের প্রকারভেদ, ধরণ, উৎপাদন ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মৎস্য চাষ

কৃত্রিম পদ্ধতিতে মাছের প্রজনন, বংশ বিস্তার, লালন-পালন এবং সংরক্ষণকে মৎস্য বা মাছ চাষ বলে। এটি বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম উপখাত। অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়, হ্রদসহ বিভিন্ন জলাভূমি থাকায় প্রাকৃতিকভাবেই এদেশ মৎস্য চাষে বিশেষ উপযোগী। একসময় এসব উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যেত। কিন্তু পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন-নদী দখল ও ভরাট, বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, কৃষিক্ষেত্রে অপরিমিত ও অবাধে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, কল-কারখানার বর্জ্য প্রভৃতি দ্বারা পানি দূষণের কারণে প্রাকৃতিকভাবে মৎস্য উৎপাদন কমে গেছে। এসব কারণে মৎস্য চাষের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে।

মৎস্য চাষের নিয়ামক : মৎস্য চাষের কতকগুলো প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক নিয়ামক রয়েছে যা এই শিল্প গড়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এসব নিয়ামকসমূহ উল্লেখ করা হলো:

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক

১. জলবায়ু : নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মৎস্য চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এদেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মৎস্য চাষ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়ামক। পৃথিবীর প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলোও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

২. ভূ-প্রকৃতি : এদেশের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি এবং উর্বর মৃত্তিকা মৎস্য চাষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে।

৩. পানির পর্যাপ্ততা: অসংখ্য পুকুর, খাল, বিল, জলাশয়ে সারাবছর পর্যাপ্ত পানি মৎস্য চাষে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এসব জলাধারগুলোতে বর্ষাকালে মৌসুমী বৃষ্টির পানি ধারণ করে সারা বছর মৎস্য চাষ করা যায়।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক

১. মূলধন : মৎস্য চাষের জন্য পুকুর বা খাল খনন, জলাধার সংরক্ষণ, পোনা সংগ্রহ, খাবার সরবরাহ প্রভৃতির জন্য পর্যাপ্ত মূলধন প্রয়োজন। অবাণিজ্যিক মৎস্য চাষের জন্য খুব বেশি মূলধন প্রয়োজন না হওয়ায় অনেকেই বাড়ি সংলগ্ন পুকুর, ডোবা, জলাশয় ইত্যাদিতে মাছ চাষ করে থাকে। তবে ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষের জন্য পর্যাপ্ত মূলধন প্রয়োজন।

২. বাজার : বাজারের চাহিদার উপর মৎস্য চাষ নির্ভর করে। প্রচলিত আছে 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। এদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যের অন্যতম অনুষঙ্গ মাছ। মৎস্যের ব্যাপক চাহিদা মৎস্য চাষ প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. শ্রমিক : বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য চাষের জন্য পর্যাপ্ত সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন। এদেশের পর্যাপ্ত সুলভ শ্রমিক মৎস্য চাষের অনুকূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

৪. পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা : মৎস্য পচনশীল দ্রব্য হওয়ায় দ্রুত বাজারজাতকরণের জন্য উন্নত পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা প্রয়োজন। সড়ক যোগাযোগের পাশাপাশি সহজ ও সুলভ নদীপথ মৎস্য চাষের অনুকূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

৫. মৎস্য সংরক্ষণ : সারা বছর মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। মৎস্য চাষ প্রসারের জন্য উন্নত মৎস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ করলে মৎস্য চাষে জনগণ অধিক আগ্রহী হবে।

চাষকৃত মৎস্যের প্রকারভেদ : বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার মৎস্য চাষ করা হয়। নিম্নে চাষকৃত বিভিন্ন মৎস্য বর্ণনা করা হলো-

ক. চিংড়ি চাষ : চিংড়ি বাংলাদেশের অন্যতম সম্পদ। এটি সন্ধিপদ অমেরুদন্ডী জলজ প্রাণি। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলোতে চিংড়ি চাষ করা হয়। এছাড়া স্বাদু পানিতেও চিংড়ি পাওয়া যায়। নদীর মোহনা ও স্বল্প লোনা পানিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। লোনা পানিতে বাগদা এবং স্বল্প লোনা পানিতে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়ে থাকে। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কক্সবাজার প্রভৃতি জেলায় বাণিজ্যিকভিত্তিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। চিংড়ি মূলত ঘের করে চাষ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২.৭৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ২.৩৪ লক্ষ টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়।

খ. কার্প জাতীয় মৎস্য চাষ : রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস, গ্রাস কার্প, সিলভারকার্প প্রভৃতি কার্প জাতীয় মাছ। এ জাতীয় মাছ পুকুরে চাষ করা হয়। কার্প জাতীয় মাছসমূহ খাদ্য গ্রহণ করে বিভিন্ন স্তর থেকে। যেমন- কাতলা মাছ পানির উপরের স্তরের, রুই মাছ মধ্যস্তরের এবং মৃগেল, কালবাউস নিচের স্তরের খাদ্য খায়। এ কারণে একই পুকুরে এ চার জাতীয় মাছ চাষ করলে খাদ্যের অপচয় হয় না, ফলে অধিক লাভজনক হয়। একটি আদর্শ পুকুরে কার্প জাতীয় মাছ চাষ করার উপায়সমূহ হলো–

১. পুকুর প্রস্তুতকরণ;
২. সুস্থ এবং ভালো মানের পোনামাছ সংগ্রহ করা;
৩. যথাযথ উপায়ে পুকুরে পোনা ছাড়া;
৪. পোনা ছাড়ার পর সঠিকভাবে পরিচর্যা করা;
৫. মাছের জন্য পর্যাপ্ত এবং পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং
৬. মাছের রোগমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা প্রভৃতি।

গ. নাইলোটিকা জাতীয় মৎস্য চাষ : নাইলোটিকা জাতীয় মাছ কষ্টসহিষ্ণু। এ ধরনের মাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়, ফলে অধিক লাভজনক হয়। নাইলোটিকা জাতের মাছ বছরে ৩-৪ বার ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটাতে পারে। এ জাতের মাছ পুকুরে চাষ করা হয়। নাইলোটিকা জাতের মাছের মধ্যে রয়েছে নাইলোটিকা, তেলাপিয়া প্রভৃত।

ঘ. অন্যান্য মাছ : উপরিউক্ত মাছগুলো ছাড়াও মাগুর, শিং, কৈ, শোল, টাকি, পাবদা, পুটি প্রভৃতি মাছ পুকুরে চাষ করা হয়।

চাষকৃত মৎস্যের উৎপাদন : বাংলাদেশে মৎস্য চাষ করা হয় প্রধানত পুকুর, বাওড়, অর্ধ আবদ্ধ, চিংড়ির ঘের প্রভৃতিতে। সারণি ৬.৯.১ এ বিগত কয়েক বছরের চাষকৃত মৎস্যের উৎপাদন দেখানো হলো।

সারণি ৬.৯.১: বিভিন্ন খাতে চাষকৃত মৎস্যের উৎপাদন

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	মৎস্য উৎপাদন (লক্ষ টন)				
		২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
পুকুর	৩.৭২	১৩.৯২	১৪.৭৯	১৫.২৭	১৬.১৩	১৭.৩২
বাওড়	০.০৬	০.০৫২	০.০৬	১.৯৩	০.০৭	০.০৮
অর্ধ আবদ্ধ	১.৩৩	১.৩২	১.৩৯	০.০৭	২.০১	২.০৪
চিংড়ি খামার	২.৭৬	১.৯৬	২.০৪	২.১৬	২.২৩	২.৩৪

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ৯২)

মৎস্য চাষের গুরুত্ব : আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মৎস্য। বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক উৎসগুলো থেকে মৎস্য সরবরাহ কমে যাওয়ায় মৎস্য চাষের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে। এছাড়া ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠির প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্য চাষের বিকল্প নেই। সরকার মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে মৎস্য চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকেই মৎস্য চাষের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার মৎস্য চাষ সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রাণিজ আমিষের একটি অন্যতম প্রধান উৎস মৎস্য। নদীসহ অন্যান্য জলাশয়, সামুদ্রিক উৎস এবং মৎস্য চাষের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে দেশে মৎস্য চাষ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে চাষকৃত মৎস্যের মধ্যে চিংড়ি, কার্প জাতীয়, নাইলোটিকা অন্যতম। এসকল মাছ পুকুর, বাওড়, অর্ধ আবদ্ধ, ঘের ইত্যাদিতে চাষ করা হয়। সবচেয়ে বেশি মাছ চাষ করা হয় পুকুরে, এরপরই রয়েছে চিংড়ি ঘের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আমাদের দেশে প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস কোনটি?

(ক) দুধ (খ) মাছ (গ) ডিম (ঘ) মাংস

২। কার্প জাতীয় মাছ–

i. রুই ii. কাতলা iii. কালবাউস

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কোনটি মাছ চাষের ক্ষেত্র?

(ক) পুকুর (খ) নদী (গ) সমুদ্র (ঘ) প্লাবনভূমি

নিচের চিত্রটি লক্ষ করুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

৪। বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম উপখাত কোনটি?

(ক) ভুট্টা (খ) মৎস্য (গ) যব (ঘ) রাই

৫। প্রদত্ত তথ্যগুলো লক্ষ করুন।

i. প্রাণিজ আমিষের উৎস

ii. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যম

iii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.১০ কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি (Agriculture and Modern Technology)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

কৃষি ও আধুনিক প্রযুক্তি

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি বলতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদন এবং সংরক্ষণ করে সনাতন কৃষি কাঠামোর পরিবর্তনকে বুঝায়। কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে স্বল্প খরচে এবং সুলভে জমি চাষ, উন্নত এবং উচ্চ ফলনশীল বীজ, গুণগত মানসম্পন্ন সার ও কীটনাশক ব্যবহার, পর্যাপ্ত সেচ, ফসল কাটা-মাড়াই এবং উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ করা যায়। বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ হলেও পূর্বে প্রকৃতি নির্ভর সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হতো। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে যা এদেশের কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এবং বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার : বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. জমি চাষে প্রযুক্তি : একসময় এদেশের কৃষিজমি চাষাবাদের জন্য গরু, মহিষ এবং লাঙ্গলের উপর নির্ভরশীল ছিল। সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদের কারণে জমি যথাযথভাবে চাষ না হওয়ায় উৎপাদনে প্রভাব পড়তো এবং খরচও বেড়ে যেত। তবে বর্তমানে কৃষিজমি চাষে সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চলমান রয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকেরাও এখন জমি চাষে ভাড়ায় ট্রাক্টর বা পাওয়ার টিলার ব্যবহার করছে। এর ফলে জমি চাষে সময় কম লাগে এবং ভালোভাবে চাষও হয়। এতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২. পানিসেচে প্রযুক্তি : ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অন্যতম কৃষি উপকরণ পানিসেচ। পূর্বে কৃষিক্ষেত্রে পানির জন্য শুধুমাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হতো। এতে করে উৎপাদন নির্ভর করতো প্রকৃতির উপর এবং কৃষিকার্য ব্যাহত হতো। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষিক্ষেত্রে পানিসেচের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ডিজেল এবং বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্রের সাহায্যে পানিসেচ দেওয়া হয়। গভীর এবং অগভীর নলকূপ, সেচ প্রকল্প প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে চাহিদামতো সময়ে পানিসেচ দিয়ে ফসল চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিরি বাঁধ নির্মাণ, খাল পুনঃখনন, ভূ-উপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ, বেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি কার্যক্রম কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সারণি ৬.১০.১ এ বিভিন্ন উপায়ে সেচকৃত জমির পরিমাণ দেখানো হলো।

সারণি ৬.১০.১: সেচকৃত জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
এলএলপি ও অন্যান্য	১১.৪৫	১১.৯৬	১২.৪৬	১২.৫১	১৩.৪২
গভীর নলকূপ	৭.৫৯	৯.৩৪	৮.৭৮	৯.৬২	১১.৯৪
অগভীর নলকূপ	৩৪.১৮	৩২.৪২	৩২.৭৮	৩২.৩৫	২৯.৫৪
মোট সেচ	৫৩.২২	৫৩.৭২	৫৪.০২	৫৪.৪৮	৫৪.৯০

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৭ (পৃ.৮৯)

৩. বীজ বপনে প্রযুক্তি : বর্তমানে আমাদের দেশে আধুনিক প্রযুক্তিতে বীজ বপনের যন্ত্র ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেমন-ড্রাম সিডার নামক যন্ত্রটি দিয়ে স্বল্প সময়ে বিস্তীর্ণ জমিতে বীজ বপন করা যায়। এতে সুনির্দিষ্ট সারিতে যথাযথভাবে বীজ বপন করা যায়। এ যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে শ্রমিক এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। ফলে যন্ত্রটির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. সার প্রয়োগে প্রযুক্তি : ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৃত্তিকার গুণাগুণ অক্ষুন্ন রাখার জন্য সার প্রয়োগ করা হয়। আমাদের দেশে সাধারণত শ্রমিক দ্বারা সার ছিটানো হয় যাতে অধিক শ্রমিক এবং সময় প্রয়োজন হয়। একইসাথে সর্বত্র সমানভাবে ছিটানোও কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানে সীমিত পরিসরে মেশিনের সাহায্যে সার প্রয়োগ শুরু হয়েছে। এ প্রযুক্তির ব্যবহার সহজলভ্য করতে পারলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারবে এবং আর্থিক সাশ্রয় হবে।

৫. কীটনাশক প্রয়োগে প্রযুক্তি : পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার রোগ-বালাই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এ কারণে ফসলের ক্ষেতকে রোগ-বালাই এর হাত থেকে রক্ষার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কীটনাশক হাত দিয়ে ব্যবহার করা সময়সাপেক্ষ এবং অসচেতন হলে স্বাস্থ্যঝুঁকিও থাকে। এসব কারণে কীটনাশক ব্যবহারে প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন ছোট ছোট মেশিন ব্যবহার করা হয়।

৬. ফসল সংগ্রহে প্রযুক্তি : আমাদের দেশে জমি থেকে ফসল সংগ্রহের অন্যতম প্রধান উপায় শ্রমিক। অনেক ক্ষেত্রে সময়মতো শ্রমিকের অভাবে যথাসময়ে মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদিত ফসলের মানের উপর প্রভাব পড়ে এবং কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফসল সংগ্রহের জন্য হারভেষ্ট মেশিনের ব্যবহার শুরু হয়েছে। হারভেষ্ট মেশিনের সাহায্যে স্বল্প সময় এবং খরচে বিস্তৃত জমির ফসল সংগ্রহ করা যায়।

৭. ফসল মাড়াইয়ে প্রযুক্তি : জমি থেকে ফসল সংগ্রহের পর সাধারণত শ্রমিক দিয়েই মাড়াই করা হয়। এতে সময়, শ্রমিক এবং খরচ বেশি। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানে ফসল মাড়াইয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেমন- জমি থেকে ধান কাটার পর মাড়াইয়ের জন্য বিভিন্ন শ্যালো মেশিন এবং হস্তচালিত মাড়াই মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেকেই শ্যালো মেশিন বা হস্তচালিত এসব মেশিন ক্রয় করে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মাড়াইয়ের কাজ করে থাকে। এ প্রযুক্তির আরো উন্নত এবং সহজলভ্য হলে সময় ও অর্থের সাশ্রয় করে উৎপাদন খরচ কম রাখা সহজ হবে।

৮. যান্ত্রিক পরিবহন ব্যবস্থা : পূর্বে বাংলাদেশের সার্বিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত ছিল। অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থার কারণে উৎপাদিত কাঁচা শাকসবজিসহ অন্যান্য পণ্য দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবহনে সময় বেশি লাগত এবং ব্যয়বহুল ছিল। ফলে পচনশীল দ্রব্য নষ্ট হয়ে সার্বিকভাবে কৃষকই ক্ষতিগ্রস্থ হতো। বিগত কয়েক বছরে যাতায়াত ও পরিবহন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়ায় স্বল্প সময়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পণ্য সরবরাহ করা সহজ হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে ফসলের ক্ষেত থেকে সরাসরি ট্রাকে করে বাজারে বা দূরবর্তী গন্তব্য স্থানে পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। যা কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের উৎসাহিত করছে।

৯. ফসল সংরক্ষণে প্রযুক্তি : উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ করে পরবর্তী সময়ে চাহিদা মতো ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে ফসল সংরক্ষণের তেমন কোনো উপায় ছিল না বলে কৃষকেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতেন। কারণ উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় নগদ যে মূল্য পাওয়া যায় তাই দিয়ে বিক্রি করতে হয়। বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসল সংরক্ষণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন-আলুসহ অন্যান্য পচনশীল পণ্য সংরক্ষণে প্রায় প্রতিটি জেলাতে আধুনিক 'হিমাগার' নির্মাণ করা হয়েছে। ধান, চাল সংরক্ষণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে।

১০. উন্নত জাতের বীজ : কৃষিক্ষেত্রে দেশীয় জাতের বীজের পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নতজাতের বীজ উদ্ভাবনের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলার লবণাক্ত মৃত্তিকায় চাষ প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন জাতের ধানের আবাদ কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল হিসেবে কাজ করছে।

১১. কৃষির উন্নয়নে গণমাধ্যম প্রযুক্তি : বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সরকারি এবং বেসরকারি টেলিভিশন ও বেতার, সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান, সংবাদ পরিবেশন, কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্রিয় অবদান রাখছে। গণমাধ্যমের দ্বারা কৃষকেরা নতুন এবং উচ্চফলনশীল জাতের ফসল, ফসলের বিভিন্ন রোগ-বালাই এবং প্রতিষেধক বাজারজাতকরণ, পণ্যের বাজারদর, সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। এছাড়া মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে সকল খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারে। কৃষকেরা এ সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়ে সহজেই বাজারের চাহিদা সংশ্লিষ্ট পণ্য

উৎপাদন করে ন্যায্য মূল্য লাভ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভিত্তিক না হলেও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষকের কাছে জনপ্রিয় হচ্ছে। এজন্য কৃষি প্রযুক্তি সহজলভ্য এবং তা ব্যবহারে কৃষকদের সচেতন করতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার এবং মৃত্তিকার গুণগত মান ঠিক রাখার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় কৃষিক্ষেত্রে যেসব প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে তা বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি। কৃষিতে সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সময় ও অর্থ সাশ্রয় দেশকে দ্রুত অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে। একইসাথে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। নিশ্চিত হবে সকলের খাদ্য নিরাপত্তা। কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, বীজ বপন, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, পর্যাপ্ত সেচ, ফসল সংগ্রহ ও মাড়াইয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার, ফসল সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকারণে প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি টেকসই কৃষি নিশ্চিতে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার হলো-
i. বাঁধ নির্মাণ ii. শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন iii. ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশে পানি সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ কত হেক্টর ছিল?
(ক) ৫২.৯০ লক্ষ (খ) ৫৩.৯০ লক্ষ (গ) ৫৪.৯০ লক্ষ (ঘ) ৫৫.৯০ লক্ষ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

করিম সাহেব একজন দরিদ্র কৃষক। হালের দুইটি গরু রয়েছে যা দিয়ে নিজের জমিটুকু চাষ করে ফসল ফলান। গ্রামের অনেককে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করতে দেখে তার নিজেরও আগ্রহ বেড়ে গেল।

৩। বীজ বপনে ব্যবহার করা হয় কোন যন্ত্রটি?
(ক) হারভেস্টার (খ) ট্রাক্টর (গ) সিডার (ঘ) স্প্রেয়ার

৪। কৃষির উন্নয়নে গণমাধ্যমের কোন মাধ্যমটি ভূমিকা রাখে?
i. টেলিভিশন ii. বেতার iii. সংবাদপত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিজ ফসলসমূহকে খাদ্যশস্য এবং অর্থকরী এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। খাদ্যশস্যসমূহের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি। অর্থকরী ফসলের মধ্যে অন্যতম হলো পাট, চা, ইক্ষু প্রভৃতি। দেশের মানুষের খাদ্যের যোগান, কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় প্রকার ফসলই গুরুত্বপূর্ণ।

ক. বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য কোনটি?

খ. ইক্ষু চাষ বলয়ের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলোর নাম লিখুন।
গ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
ঘ. ধান ও গম উৎপাদনে দেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

জনাব শরীফুল সাহেব কৃষি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শেষে গ্রামে গিয়ে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করলেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করেন। তাঁর জমিতে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ গ্রামের অন্যান্য কৃষকের তুলনায় অনেক বেশি। তিনি গ্রামের কৃষকদেরও প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করেন। এতে অনেক কৃষক প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করে।

ক. বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কত?
খ. ‘সোনালী আঁশ’ বলতে কী বুঝায়?
গ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
ঘ. আরিফুল সাহেবের জমিতে অধিক ফসল উৎপাদিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

শামীমের বাড়ি উত্তরাঞ্চলের একটি জেলায় এবং করিমের বাড়ি দক্ষিণাঞ্চলের একটি জেলায়। শামীমের জেলায় একটি অর্থকরী ফসল খুব ভালো উৎপাদিত হয় যা থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্যটি শরীরে শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। অপরদিকে, করিমের জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবেশে বিশেষ ধরনের প্রাণিজ আমিষের চাষ করা হয় যা অভ্যন্তরীণ ভোগের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

ক. BADC এর পূর্ণরূপ লিখুন।
খ. কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বলতে কী বুঝায়?
গ. শামীমের এলাকায় উৎপাদিত অর্থকরী ফসলটির উৎপাদনকারী অঞ্চল এবং গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
ঘ. করিমের এলাকায় চাষকৃত প্রাণিজ আমিষের উৎসটি শামীমের এলাকায় কেন চাষ করা যায় না-ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১ :	১. খ	২. ক	৩. গ	৪. ঘ	৫. ক	৬. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২ :	১. ঘ	২. খ	৩. গ	৪. খ	৫. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩ :	১.গ	২.ক	৩.ঘ	৪. ক	৫. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪ :	১.ক	২. খ	৩. ক	৪. ক	৫. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৫ :	১.ক	২. গ	৩. ঘ	৪. গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৬ :	১. খ	২. ক	৩. ক	৪. গ	৫. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৭ :	১. ক	২. ঘ	৩. গ	৪. খ	৫. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬. ৮ :	১. খ	২. ক	৩. ক	৪. ক	৫. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৯ :	১. খ	২.গ	৩. ক	৪. খ	৫. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১০ :	১. ঘ	২.গ	৩. গ	৪. ঘ		